মাসিক
আল-আবরার
الأبرار
The Monthly AL-ABRAR
রেজি: নং- ১৪৫ বর্ষ-১, সংখ্যা-১০
مجلة شهرية دعوية فكرية ثقافية اسلامية
নভেম্বর ২০১২ইং, যিলহজ্ব ১৪৩৩হি:
ذو الحجة الحرام ١٤٣٣هـ، نوفمبر ٢٠١٢م

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক
ফক্বীহুল মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান (দামাত বারাকাতুহুম)
প্রধান সম্পাদক
মুফতী আরশাদ রহমানী
সম্পাদক
মুফতী কিফায়াতুল্লাহ শফিক
নির্বাহী সম্পাদক
মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী
সহকারী সম্পাদক
মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন
বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
মুহাম্মদ হাশেম
সার্কুলেশন ম্যানেজার
মাওঃ নাসির উদ্দীন

সম্পাদনা বিষয়ক উপদেষ্টা
মুফতী জামাল উদ্দীন
মুফতী এনামুল হক্ব কাসেমী
মুফতী মাহমূদুল হক্ব
মুফতী মুহাম্মদ সুহাইল
মুফতী আব্দুস সালাম
মাওলানা হারুন
মুফতী রফীকুল ইসলাম আল-মাদানী
মুফতী জা'ফর আলম কাসেমী

প্রচ্ছদ : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ বসুন্ধরা, ঢাকার ৪তলা বিশিষ্ট ছাত্রাবাসের একাংশ।

বিনিময়ঃ ১৫ (পনের) টাকা মাত্র

প্রচার সংখ্যা - ১০,০০০(দশ হাজার)

যোগাযোগ

সম্পাদনা দফতর
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ
ব্লক-ডি, ফক্বীহুল মিল্লাত স্মরণী, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা।
ফোন: ০২৮৪০২০৯১,০২৮৮৪৫১৩৮
ই-মেইলঃ monthlyalabrar@gmail.com
ওয়েভ :http://monthlyalabrar.wordpress.com/

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ২
পবিত্র কালামুল্লাহ থেকে ৪
পবিত্র সুন্নাহ থেকে ৬
দরসে ফিক্বহ ৮
মুফতী শাহেদ রহমানী
হযরত হারদূয়ী (রহ.) এর অমূল্য বাণী ১০
মুফতী মুহাম্মদ সুহাইল
মালফূযাতে ফক্বীহুল মিল্লাত ১১
মাওলানা মুহাম্মদ লোকমান
"সিরাতে মুস্তাকীম" বা সরলপথ-৪ .... ১৩
মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক্ব
শেয়ার বাজার-২..................................... ১৭
মুফতী এনামুল হক্ব কাসেমী
কোয়ান্টাম মেথড-৭................................. ২১
মুফতী শরীফুল আজম
আলেম সমাজের প্রতি বিদ্বেষ : ভয়াবহ পরিণতির দিকে সমাজ ২৪
মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন
হুজ্জাতুল ইসলাম কাসেম নানুতভী (রহ.) ২৮
আবু নাঈম মুফতী মুঈনুদ্দীন
জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান ৩১
নবীজী (সা.) যেভাবে নামায পড়তে বলেছেন-১ ৩৫
মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী
উদীয়মান কাফেলা ৪০

মোবাইল: প্রধান সম্পাদক:০১৮১৯৪৬৯৬৬৭, সম্পাদক:০১৮১৭০০৯৩৮৩, নির্বাহী সম্পাদক:০১১৯১২৭০১৪০ সহকারী সম্পাদক: ০১৮১২৩৫৭৫২২
বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি: ০১৭১১৮০৩৪০৯ সার্কুলেশন ম্যানেজার : ০১৮৩১৭৪০৫৪০

সম্পাদকীয়

ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠাই হোক হিজরী নতুন বছরের দৃঢ় প্রত্যয়

নিশ্চয়ই যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, অতঃপর অবিচল থাকে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিত হবে না। তারাই জান্নাতের অধিকারী। তারা তথায় চিরকাল থাকবে। তারা যে কর্ম করত, এটা তারই প্রতিফল। (আহকাফ ১৩,১৪,১৫)

মুসলিম উম্মাহর আপন আদর্শে অটুট থাকাই বর্তমান দুনিয়ার সবচাইতে বড় চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সর্বপ্রথম ও প্রধান বিষয় হলো আপন আদর্শ সম্পর্কে অনুভূতি, ভালবাসা এবং তা বাস্তবায়নের দৃঢ় প্রত্যয়।

আল্লাহর দেওয়া বিধান এবং মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বাস্তব আদর্শই হলো ইসলাম। নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আদর্শ অনুসরণে আল্লাহর বিধান জীবনের প্রতিটি স্তরে বাস্তবায়ন করা এবং এর উপর অটুট-অবিচল ও স্থির থাকা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আবশ্যক। মানবজাতির যাবতীয় সফলতা তাতেই বিদ্যমান।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ...

নিশ্চয়ই যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, অতপর অবিচল থাকে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিত হবে না। তারাই জান্নাতের অধিকারী। তারা তথায় চিরকাল থাকবে। তারা যে কর্ম করত, এটা তারই প্রতিফল। (আহকাফ ১৩,১৪,১৫)

হযরত আলী (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قلت يا رسول الله أوصنى فقال :قل ربى الله ثم استقم .قال :قلت :ربى الله وما توفيقى الا بالله عليه توكلت واليه انيب .فقال :ليهنك العلم، ابا الحسن.(مرقاة المفاتيح ١/١٥٤)

আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে উপদেশ দিন। নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, তুমি বল আল্লাহ তা'আলা আমার পালন কর্তা এবং এর উপর অটল-অবিচল থাক। হযরত আলী (রা.) বলেন, আমি বললাম, আমার মালিক আল্লাহ, সবকিছুর তাওফীক আল্লাহ তা'আলাই দান করেন, তাঁর উপরই ভরসা, তাঁর সামনেই আমি নত হই। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করলেন, হে আবুল হাসান তোমার এই ইলম বরকতময় হোক।

মানবীয় স্বভাব হলো যে কোনো ভালো আদর্শকে গ্রহণ করা। এটি তার আলোকিত প্রকৃতি। ইসলামের যাবতীয় আদর্শই হলো মানবপ্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য। শত চেষ্টা চালিয়েও ইসলামে এমন কোনো বিধান বা আদর্শ এপর্যন্ত কেউ আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়নি যা মানব প্রকৃতির বিপরীত, এর সাথে সাংঘর্ষিক বা মানবজাতির জন্য অকল্যাণকর।

আল্লাহ প্রদত্ত সার্বজনীন প্রকৃতিসম্মত আদর্শ বলেই সারা দুনিয়া ইসলামের সত্যতা ও সফলতার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য। সে কারণেই অতি স্বল্প সময়ে ইসলামের জয়জয়কার আরম্ভ হয় পৃথিবী ব্যাপী। যা প্রারম্ভ কাল থেকেই ইসলাম এবং মুসলমানগণের দুশমনদের কাছে সহনীয় ছিল না, এখনও নেই।

যুগ যুগ ধরে ইর্ষান্বিত অমুসলিম দুনিয়ার ইসলাম ও ইসলামী আদর্শকে প্রশ্নবিদ্ধ করার হাজারো প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় আধুনিক যুগে আরম্ভ করা হয় মুসলমানদের চরিত্র ও আদর্শ নিয়ে মিডিয়া ত্রাস। ইসলাম বিদ্বেষী মিডিয়া মুসলমানদের বিভিন্ন অপরাধকে সত্যমিথ্যার প্রলেপ দিয়ে সারা দুনিয়ায় প্রচার করে একথাটিই মানুষের অন্তরে বসিয়ে দিতে চায়, মুসলমানগণ আদর্শহীন, বর্বর একটি জাতি। ইসলাম মানুষকে শুধু গোঁড়ামী, উগ্রতা ইত্যাদি অপকর্মেরই শিক্ষা দেয়। যা বর্তমান আধুনিক সভ্য যুগের মানব সমাজে চর্চিত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। নাউজু বিল্লাহ।

মিডিয়া ত্রাসের ফলে অমুসলিমরা তো আছেই স্বয়ং মুসলমানদের অনেকে পুরোপুরি মিডিয়ার উপর আস্থাশীল হয়ে স্বয়ং মুসলমানদের প্রতি তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যায়। ইসলামী আদর্শে বেড়ে ওঠা মুসলমানদেরকে খাটো করতেও তারা এখন দ্বিধা করছে না। একটি জাতির জন্য সবচাইতে ভয়াবহ হলো এই সর্বশেষ অবস্থাটি। পবিত্র কুরআনের ভাষায় এরূপ লোকদেরকে চিত্রায়িত করা হয়েছে এভাবে –

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ...

আর তারা যখন ঈমানদারদের সাথে মিশে তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আবার যখন তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করে তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথে রয়েছি– আমরা তো (মুসলমানদের সাথে) উপহাস করি মাত্র। বরং আল্লাহই তাদের সাথে উপহাস করেন আর তাদেরকে তিনি ছেড়ে দিয়েছেন যেন তারা নিজেদের অহংকার কুমতলবে হয়রান ও পেরেশান থাকে। তারা সে সমস্ত

লোক যারা হেদায়াতের বিনিময়ে গোমরাহী খরীদ করে। বস্তুতঃ তারা তাদের এই ব্যবসায় লাভবান হতে পারেনি এবং তারা হেদায়াতও লাভ করতে পারেনি। (সূরা বাকারা-১৪,১৫,১৬)

মুসলমানদের ঘরে জন্ম নেওয়া এরূপ লোকদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার স্পষ্ট বাণী কোনো কালেও বাস্তবতার ব্যতিক্রম হয়নি এবং হবেও না।

অথচ বর্তমান আধুনিক যুগে মানব সৃষ্ট হাজারো মত-পথ ও চিন্তাধারার মাঝেও যদি তুলনা করা হয়, ইসলামের আদর্শের চেয়ে সুন্দর কোনো আদর্শ হতে পারে না। যদি কোনো দেশে খুব সুন্দর আদর্শ আংশিকভাবে পরিচালিত তাও স্বয়ং ইসলাম এবং মুসলমানদের কাছ থেকে নেওয়া। ইতিহাস এর জ্বাজল্যমান সাক্ষি।

ইসলামের মৌলিক আদর্শ হলো তাকওয়া বা খোদাভীতি অর্জন, কল্যাণকর কাজ করা এবং গর্হিত কাজ পরিহার করা। মানুষকে কল্যানের দিকে ডাকা এবং গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখা। এই মৌলিক বিধানের বিস্তারিত ব্যাখ্যা খুবই সুদীর্ঘ-প্রলম্ব। সংক্ষিপ্ত কয়েকটি হলো–

আল্লাহ তা'আলার ভয়, আল্লাহর উপর ভরসা, আল্লাহর শোকর, তাওবা ও ক্ষমা চাওয়া, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মুহাব্বত, পবিত্র গ্রন্থ কুরআনের প্রতি ভক্তি ও তেলাওয়াত, ইলম শিক্ষা, আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখা, আত্মীয়ের হক্ব আদায়, মাতা-পিতার মুহাব্বত ও তাদের হক্ব আদায়, সন্তান সন্ততির তারবিয়্যাত ও শিক্ষার ব্যবস্থা, স্বামী স্ত্রীর মুহাব্বত ও প্রাপ্য আদায়, বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশীদের সাথে সুসম্পর্ক, হক আদায়, অনাথ গরীব, অক্ষমদের সাহায্য করা ও তাদের প্রাপ্য সম্মান দেওয়া, মানুষের পরস্পরে সন্ধিস্থাপন, কথাবার্তার শালীনতা, সমাজ ও সামষ্টিকতার মূল্যবোধ, হালাল আহার, মেহমানদারী ইত্যাদি সকল মানবীয় বিষয়ে সুস্পষ্ট ও উন্নত বিধান প্রদান করেছে ইসলাম।

মানুষ হিসেবে ভাল ভাল গুণগুলোই গ্রহণ করতে বলা হয়েছে মুসলমানদেরকে। যেমন- তাযকিয়ায়ে নাফস তথা নফসকে পরিচ্ছন্ন করা, ভাল কাজের দিকে বিলম্ব না করা, ভাল লোকদের সান্নিধ্য অর্জন করা, হাসি মুখে দেখা, কথা বলা এবং পরস্পর সাক্ষাৎ করা, লাজলজ্জা, বিপদগ্রস্তদের সহমর্মিতা, এয়াতীমদের মাথায় হাত বোলানো, মুসলমানদের ইজ্জতের সংরক্ষণ, আমানতদারী, পর্দাগ্রহণ, ছোটদের স্নেহ, বড়দের ভক্তি, দাওয়াত গ্রহণ, সালাম, ওয়াদা পূরণ করা, সময়ের মূল্যায়ন, জিহ্বা সংযত রাখা, সত্য বলা, উপহার দেওয়া, সংষয়যুক্ত কথা ও কাজ থেকে মুক্ত থাকা, সংযমী হওয়া, সংশোধন করা, ইনসাফ করা, সদকা খায়রাত করা ইত্যাদি ভাল ভাল গুণগুলোকে গ্রহণ করতে বলা হয়েছে এবং এর পদ্ধতিও ইসলাম পরিপূর্ণভাবে বাতলে দিয়েছে।

আবার মানুষের যাবতীয় খারাপগুণ থেকে বাধা প্রদান করা হয়েছে।যেমন, গীবত তথা পরচর্চা, দুতিয়ালী, কারো গোপনীয়তা প্রকাশ করা, মিথ্যা বলা, গালিগালাজ, হঠকারিতা, অপবাদ, প্রোপাগাণ্ডা, ঠাট্টা, অর্থহীন উদ্দেশ্যহীন কাজ, কথা কাজে মিল না থাকা, জগড়া ফ্যাসাদ,অহংকার, পরশ্রীকাতরতা, অহমিকা, গোঁড়ামী, প্রতারণা, অন্যের হক্ব নষ্ট করা, খুন, হত্যা, রাহজানী, দূর্নীতি, লজ্জাহীনতা, বৈরীতা, অন্যের প্রতি খারাপ ধারণা, রাগ, কার্পণ্যতা, অমিত ব্যয়, বহুরূপ ধারণ, কাম ইত্যাদি ইত্যাদি মানবীয় জীবনে সম্ভাব্য সকল অসৎ ও খারাপ গুণকে না করেছে ইসলাম।

মানবীয় আদর্শের এরূপ বিস্তারিত ব্যাখ্যা এবং বাস্তবায়ন থাকা সত্বেও ওসব আধুনিকবাদী মুসলমানরা কোন বস্তুর অভাবে বা কোন অজুহাতে মুসলমান এবং ইসলামের আদর্শ নিয়ে এত অপপ্রচার চালাতে উৎসাহী হয়ে ওঠে তা বলাই বাহুল্য।

সম্প্রতি একটি আন্তর্জাতি জরীপে সুখী দেশসমূহের পরিসংখ্যানে বাংলাদেশকে ষোল নাম্বারে স্থান দেওয়া হয়েছে। বাস্তবতাও এর ব্যতিক্রম নয়। কারণ উন্নত বিশ্বগুলোর তুলনায় বাংলাদেশ একটি গরীব এবং ছোট রাষ্ট্র। সেই হিসেবে এদেশের প্রত্যেক বিভাগে অভাবের একটা ধারা আছে। উন্নত বিশ্বের তুলনায় এদেশের সিকিউরিটি সিষ্টেম খুবই নগণ্য। তার পরেও উন্নত বিশ্বের তুলনায় এদেশে মৌলিক অপরাধ অনেক কম। এর কারণ হলো একমাত্র ধর্মীয় আদর্শের অনুভুতি। ধর্মীয় অনুভুতি ও মানবীয় গুণই এদেশের জনগণের শৃংখল। আমেরিকার মত দেশেও সম্প্রতি স্যান্ডি নামের সুনামী আঘাত হানার পর যে লুটপাটের চিত্র দেখা গেছে তা থেকে অনুমান করা যায় সে সব দেশেও অপরাধের কি ভয়াবহ চিত্র হতে পারে।

মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের আপন গণ্ডিতে শান্তি, শৃংখলা ও স্থিতিশীলতার জন্য সবচাইতে বড় ভুমিকা থাকে আপন ধর্মের আদর্শিক অনুভূতি। এরূপ অনুভূতির কারণে কোনো কোনো মুসলিম রাষ্ট্রে হঠাৎ শান্তি ফিরে আসুক এবং পৃথিবীর বুকে ইসলামী আদর্শের বাস্তবায়নের কারণে শান্তির কোনো মডেল তৈরী হোক এটা অমুসলিম দুনিয়ার জন্য কোনো ক্রমেই সহনীয় নয়। মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের বিরুদ্ধে দীর্ঘ ষড়যন্ত্রের এটিও একটি বড় কারণ।

কিন্তু মুসলিম উম্মাহ যদি সম্বিৎ ফিরে পায়, তাদের অন্তরে যদি চেতনা জাগরিত হয় এবং ইসলামী আদর্শ সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে প্রত্যেকে আপন জীবনের প্রতিটি স্তরে ইসলামী আদর্শকে বাস্তবায়নের ব্রতি গ্রহণ করতে সক্ষম হয় তবে নিশ্চয় যাবতীয় চ্যালেঞ্জ ও ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করা সম্ভব হবে।

আর তা অর্জিত হওয়ার জন্য মুসলিম উম্মাহের সকল অভিবাবক, সকল মাতাপিতাকে আপন আপন অধীনস্তদের শিক্ষা দীক্ষার পাশাপাশি আদর্শ গঠনের ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে মুসলিম সরকারের দায়িত্বও কম নয়।

হিজরী নতুন বছর আগমনে ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নই হোক পুরো মুসলিম উম্মাহর দৃঢ় প্রত্যয়, এই কামনায়...।

আরশাদ রহমানী

ঢাকা।০২-১১-২০১২

পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ থেকে

উচ্চতর তাফসীর গবেষণা বিভাগ :
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

(١) الهكم التكاثر (٢) حتى زرتم المقابر (٣) كلاسوف تعلمون (٣)ثم كلا سوف تعلمون (٤) كلا لو تعلمون علم اليقين (٥)لترون الجحيم (٦) ثم لترونها عين اليقين (٧) ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم

১। প্রাচুর্যের লালসা তোমাদেরকে গাফিল রাখে। ২। এমনকি, তোমরা কবরস্থানে পৌছে যাও। ৩। এটা কখনও উচিত নয়। তোমরা সত্বরই জেনে নেবে ৪। অতঃপর এটা কখনও উচিত নয় তোমরা সত্বরই জেনে নেবে। ৫। কখনওই নয়; যদি তোমরা নিশ্চিত জানতে! ৬। তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে, ৭। অতঃপর তোমরা তা অবশ্যই দেখবে দিব্য-প্রত্যয়ে, ৮। এরপর অবশ্যই সেদিন তোমরা নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

তাফসীরের সার-সংক্ষেপ

(পার্থিব সম্পদের) বড়াই তোমাদেরকে (পরকাল থেকে) গাফিল করে রাখে। এমনকি, তোমরা কবরস্থানে পৌছে যাও (অর্থাৎ মরে যাও) (ইবনে কাসীর) কখনই নয়, (অর্থাৎ পার্থিব সম্পদ বড়াই করার যোগ্য নয় এবং পরকাল গাফিল হওয়ার উপযুক্ত নয়) যদি তোমরা নিশ্চিত জানতে! (অর্থাৎ বিশুদ্ধ প্রমাণাদিতে চিন্তা ও মনোনিবেশ করতে এবং এ বিষয়ে প্রত্যয় অর্জন করতে, তবে কখনও বড়াই করতে না এবং পরকাল থেকে উদাসীন হতে না)। তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে, (আবার বলি) তোমরা অবশ্যই তা দেখবে দিব্য-প্রত্যয়ে। কেননা এই দেখা প্রমাণাদির পথে হবে না , যাতে প্রত্যয় অর্জনে সামান্য বিলম্ব হতে পারে বরং এটা দিব্য দৃষ্টিতে দেখা হবে। (চাক্ষুষ দেখাকে এখানে দিব্য প্রত্যয়ে দেখা বলা হয়েছে।) অতঃপর আবার শুন তোমরা অবশ্যই সেদিন নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। (আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতসমূহের হক ঈমান ও আনুগত্যের মাধ্যমে আদায় করেছ কিনা এ প্রশ্ন করা হবে।

আনুষাঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়:

الهاكم التكاثر-تكاثر শব্দটি كثرة থেকে উদ্ভূত। অর্থ প্রচুর ধনসম্পদ সঞ্চয় করা। হযরত ইবনে আব্বাস রা. ও হাসান বসরী রা. এ তাফসীরই করেছেন। এ শব্দটি প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কাতাদাহ রা. এ অর্থই করেছেন। ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার এ আয়াত তিলাওয়াত করে বললেন, এর অর্থ অবৈধ পন্থায় সম্পদ সংগ্রহ করা এবং আল্লাহর নির্ধারিত খাতে ব্যয় না করা। (কুরতুবী)

حتى زرتم المقابر এখানে কবরস্থান যিয়ারত করার অর্থ মরে কবরে পৌছা। এক হাদিসে রাসুলুল্লাহ রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন: حتى ياتيكم الموت (ইবনে কাসীর) অতএব আয়াতের মর্মার্থ এই যে,ধনসম্পদের প্রাচুর্য অথবা ধনসম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও বংশ-গোত্রের বড়াই তোমাদেরকে গাফিল ও উদাসীন করে রাখে, নিজেদের পরিণতি ও পরকালের হিসাব-নিকাশের কোন চিন্তা তোমরা করনা এবং (এমনি অবস্থায়) তোমাদের মৃত্যু এসে যায়। আর মৃত্যুর পর তোমরা আযাবে গ্রেফতার হও। একথা বাহ্যত সাধারণ মানুষকে বলা হয়েছে, যারা ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততির ভালবাসায় অথবা অপরের সাথে বড়াই করায় এমন মত্ত হয়ে পড়ে যে, পরিণাম চিন্তা করার ফুরসতই পায় না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে শিখখীর (রা.) বলেন আমি একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট পৌছে দেখলাম, তিনি الهاكم التكاثر তিলাওয়াত করে বলছিলেন:

يقول ابن ادم مالى مالى لك من ما لك الا ما اكلت فافنيت او البست فابليت او تصدقت فا مضيت وفى رواية لمسلم وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس-

মানুষ বলে, আমার ধন, আমার ধন অথচ তোমার অংশতো ততটুকুই, যতটুকু তুমি খেয়ে শেষ করে ফেল অথবা পরিধান করে ছিন্ন করে দাও অথবা সদকা করে সম্মুখে পাঠিয়ে দাও। এছাড়া যা আছে, তা তোমার হাত থেকে চলে যাবে। তুমি অপরের জন্য তা ছেড়ে যাবে। (ইবনে কাসীর , তিরমিযী, আহমদ)

হযরত আনাস(রা.) থেকে বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে রাসুলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

لو كان لابن ادم واديامن ذهب لاحب ان يكون له واديان ولن يملاء فاه الا التراب ويتوب الله على من تاب -

আদম সন্তানের যদি স্বর্ণে পরিপূর্ণ একটি উপত্যকা থাকে, তবে সে (তাতেই সন্তুষ্ট হবে না) বরং দুটি উপত্যকা কামনা করবে। তার মুখ তো কবরের মাটি ব্যতীত জন্য কিছু দ্বারা ভর্তি করা সম্ভব নয়। যে আল্লাহর দিকে রুজু করে, আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন। (বুখারী)

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) বলেন, আমরা সুরা তাকাছুর নাযিল হওয়া পর্যন্ত উপরোক্ত হাদিসকে কুরআন মনে করতাম। মনে হয় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম التكاثر الهاكم পাঠ করে তার ব্যাখ্যায় উপরোক্ত উক্তিটি করেছিলেন। এতে কোন কোন সাহাবী তার উক্তিকেও কুরআনের ভাষা মনে করলেন। পরে যখন সম্পূর্ণ সুরা সামনের আসে, তখন তাতে এসকল বাক্য ছিল না। ফলে প্রকৃত অবস্থা ফুটে উঠে যে, এগুলো ছিল তাফসীরের বাক্য।

لو لوتعلمون علم اليقين এর জওয়াব এ স্থলে উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ لما الهاكم التكاثر উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা যদি কিয়ামতের হিসাব-নিকাশে নিশ্চিত বিশ্বাসী হতে, তবে কখনও প্রাচুর্যের বড়াই করতে না এবং উদাসীন হতে না।

لترونها عين اليقين ثم উপরে বলা হয়েছে عين اليقين এর অর্থ সে প্রত্যয়, যা চাক্ষুষ দর্শন থেকে অর্জিত হয়। এটা বিশ্বাসের সর্বোচ্চ স্তর । হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, মুসা আ. যখন তূর পর্বতে অবস্থান করছিলেন এবং তার অনুপস্থিতিতে তার সম্প্রদায় গৌবৎসের পুজা করতে শুরু করছিল। তখন আল্লাহ তা'আলা তূর পর্বতেই তাকে অবহিত করেছিলেন যে, বনী ইসরাঈলরা গৌবৎসের পূজায় লিপ্ত হয়েছে। কিন্তু মুসা আ. এর মধ্যে এর তেমন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়নি, যেমন ফিরে আসার পর স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার ফলে দেখা দিয়েছিল। তিনি ক্রোধে আত্মহারা হয়ে তওরাতের তক্তিগুলো হাত থেকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। (মাযহারী)

ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم অর্থাৎ তোমরা সবাই কিয়ামতের দিন আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে যে, সেগুলোর শোকর আদায় করেছ কি না এবং পাপ কাজে ব্যয় করেছ কিনা? তন্মধ্যে কিছুসংখ্যক নিয়ামতের সুস্পষ্ট উল্লেখ কুরআনের অন্য আয়াতে এভাবে করা হয়েছে: ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا এতে মানুষের শ্রবণশক্তি হৃদয় সম্পর্কিত লাখো নিয়ামত অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, যেগুলো সে প্রতি মুহূর্তে ব্যবহার করে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন কিয়ামতের দিন মানুষকে সর্বপ্রথম তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে । বলা হবে আমি কি তোমাকে সুস্বাস্থ্য দেইনি, আমি কি তোমাকে ঠাণ্ডা পানি পান করতে দেইনি? (তিরমিযী)

অন্য এক হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর আদায় না করা পর্যন্ত হাশরের মাঠে কেউ স্বস্থান ত্যাগ করতে পারবে না এক. সে তার জীবনের দিনগুলো কি কি কাজে নিঃশেষ করেছে? দুই. সে তার যৌবনশক্তিকে কি কাজে ব্যয় করেছে? তিন.সে যে সম্পদ উপার্জন করেছিল তা বৈধ পন্থায়, না অবৈধ পন্থায় উপার্জন করেছে? চার. সে সেই ধনসম্পদ কোথায় কোথায় ব্যয় করেছে? পাঁচ. আল্লাহ প্রদত্ত ইলম অনুযায়ী সে কতটুকু আমল করেছে? (বুখারী)

তাফসীরবিদ ইমাম মুজাহিদ (রা.) বলেন কিয়ামতের দিন এ ধরণের প্রশ্ন প্রত্যেক ভোগবিলাস সম্পর্কে করা হবে, তা পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ বাসস্থান সম্পর্কিত ভোগবিলাস হোক কিংবা সন্তান-সন্ততি, শাসনক্ষমতা অথবা প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্পর্কিত ভোগবিলাস হোক। কুরতুবী এ উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন এটা একান্ত যথার্থ যে, কোন বিশেষ নিয়ামত সম্পর্কে এ প্রশ্ন করা হবে না।

সুরা তাকাছুরের বিশেষ ফযীলত:

রাসুলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম. একবার সাহাবায়ে কিরামকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের মধ্যে কারও এমন ক্ষমতা নেই যে, এক হাজার আয়াত পাঠ করবে। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন হ্যাঁ, এক হাজার আয়াত পাঠ করার শক্তি কয়জনের আছে! তিনি বললেন, তোমাদের কেউ কি সুরা তাকাছুর পাঠ করতে পারবেনা? উল্লেখ্য এই যে, দৈনিক এই সুরা পাঠ করা এক হাজার আয়াত পাঠ করার সমান। (মাযহারী)

সূত্র : তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন

পবিত্র সুন্নাহ থেকে

উচ্চতর হাদীস গবেষণা বিভাগ : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

আশুরার তাৎপর্য এবং করণীয় ও বর্জণীয়ঃ

হিজরী সনের প্রথম মাস মুহাররম। মুহাররম শব্দের অর্থই হলো মর্যাদাপূর্ণ। অনেক ইতিহাস-ঐতিহ্য ও রহস্যময় তাৎপর্য নিহিত রয়েছে এ মাসকে ঘিরে। এসব কারণেই এ মাসটি মর্যাদাপূর্ণ। তাই এ মাসের নামকরণ হয়েছে মুহাররম বা মর্যাদাপূর্ণ। এমাসেরই ১০ তারিখে আমাদের মাঝে প্রতি বছর ঘুরে আসে মুসলিম বিশ্বের তাৎপর্যপূর্ণ সেই আশুরার দিন। এ দিনের সর্বাপেক্ষা আলোড়িত ও আলোচিত বিষয় হলো কারবালার ইতিহাস। মূলত এ দিনের তাৎপয, ইতিহাস-ঐতিহ্য আরো প্রাচীন। কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা এ দিনের একটি বিরল কাহিনী মাত্র। এ দিনে যা যা ঘটেছে এর দাস্তান অনেক লম্বা-অনেক পূর্বের। নির্ভরযোগ্য হাদিসের আলোকে এ দিনের একটি বৃহৎ ও অবিস্বরণীয় ঘটনা ও এ প্রসঙ্গে আমাদের করণীয় নিম্নে আলোকপাতের প্রয়াস পাবো।

আশুরার ঐতিহ্যঃ

আশুরার ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এবং স্বরণীয় বরণীয় ঘটনার শীর্ষে স্থান পায় হযরত মূসা আ. এর একটি ঘটনা। এই দিনে তিনি অত্যাচারী শাসক ফিরআউনের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। মহাপরাক্রমশালী প্রভূ আল্লাহপাক সেদিন চিরকালের জন্য নীল নদে ডুবিয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন ভ্রান্ত খোদা দাবিদার ফিরআউন ও তার বিশাল বাহিনীকে । এ ঘটনার বিবরণে ইমাম বুখারী রহ. সাহাবী হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন-

ان رسول الله ﷺ قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء فقال لهم رسول الله ﷺ ما هذا اليوم الذى تصومون؟ قالوا هذا يوم عظيم انجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه، فصام موسى شكرا فنحن نصومه فقال انا اولى بموسى منهم، فصامه وامر بصيامه۔

."মহানবী সা. হিজরত করে মদীনা শরীফে পৌঁছে মদীনার ইহুদীদেরকে আশুরার দিনে রোযা পালন করতে দেখেন। রাসুল সা. তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, এই দিনে কী ঘটেছে যে, তোমরা এতে রোযা পালন করো? তারা বলে এই দিনটি অনেক বড় দিন, এই দিনে আল্লাহ পাক মূসা আ. ও তাঁর সাথীগণকে ফিরআউন থেকে রক্ষা করেছিলেন এবং ফিরআউন ও তার বাহিনীকে ডুবিয়ে মেরেছিলেন। এরই কৃতজ্ঞতা স্বরুপ হযরত মুসা আ. রোযা রাখতেন, তাই আমরাও আশুরার রোযা পালন করে থাকি। ইহুদীদের উত্তর শুনে রাসুলে করীম সা. বললেন, হযরত মূসা আ. এর কৃতজ্ঞতার অনুসরণে আমরা তাদের চেয়ে অধিক যত্নশীল হওয়ার অধিকারী। অতপর তিনি নিজেও আশুরার রোযা রাখেন এবং মুসলমানদেরকে তা পালন করতে নির্দেশ প্রদান করেন।" (বুখারী শরীফ ৩৩৯৭, মুসলিম শরীফ ১১৩৯)

উপরোক্ত হাদীসের আলোকে কয়েকটি বিষয় পর্যালোচনার দাবি রাখে।

ক. হযরত মূসা (আ) ফিরআউন থেকে আশুরার দিন রক্ষা পেয়েছিলেন। তা নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য। যা বুখারী ও মুসলিম শরীফের সহীহ সনদের দাবি। এছাড়া অন্যান্য হাদীসে ও বিভিন্ন বই পুস্তকে বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ আছে। এর অধিকাংশই দুর্বল বর্ণনার মাধ্যমে বা কোন হাদীসের কিতাবে খুঁজেই পাওয়া যায় না। তাই ঐসব উল্লেখ করা সমীচীন বা প্রয়োজনীয় মনে করছি না।

খ. অনেকে আশুরার ঐতিহ্য বলতে রাসূল সা. এর প্রিয়তম দৌহিত্র হযরত হুসাইন রা. এর শাহাদাত ও নবী পরিবারের কতিপয় সম্মানিত সদস্যের রক্তে রঞ্জিত কারবালার ইতিহাসকেই বুঝে থাকে। তাদের অবস্থা ও কাজ কর্ম দেখে মনে হয় কারবালার ইতিহাসকে ঘিরেই আশুরার সব ঐতিহ্য, এতেই রয়েছে আশুরার সব রহস্য। উপরোল্লেখিত হাদীসের আলোকে প্রমাণ হয়, আসলে তা নয়। বরং আশুরার ঐতিহ্য চলে আসছে আরো প্রাচীনকাল থেকে। হযরত হুসাইন রা. এর ঘটনার অনেককাল পূর্ব থেকেই আশুরা অনেক তাৎপর্যপূর্ণ রহস্য ঘেরা দিন। কারণ কারবালার যুদ্ধ সংঘটিত হয় ৬১ হিজরীর ১০ই মুহাররম। আর আশুরার রোযার প্রচলন চলে আসছে ইসলামের সূচনা অধ্যায়েরও পূর্বকাল থেকে।

অবশ্য এ কথা সত্য যে, আবহমান কাল থেকে আশুরার তারিখে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনা যেমন অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ, হিজরী ৬১ সনে আশুরার দিন কারবালার রক্তপাতের ঘটনাও অতিশয় হৃদয় বিদারক। তবে এ ঘটনাকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে না পেরে আজ অনেকেই ভ্রষ্টতা ও কুসংস্কারের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হতে যাচ্ছে। কারবালার মর্মান্তিক ঘটনাকে আমরা যারা ব্যাথাভরা অন্তরে স্মরণ করে থাকি, আমরা কি কোনদিন চিন্তা করেছি কী কারণে হযরত হুসাইন রা. কারবালার ময়দানে অকাতরে নিজের জীবন বিলিয়ে দিলেন? তাইতো অনেকেই জারি-মরসিয়ার মাধ্যমে কারবালার তাৎপর্য পালন করে থাকে। আসলে হযরত হুসাইন রা. এর উদ্দেশ্য ও আদর্শ বাস্তব জীবনে অনুসরণ করাই হবে এ ঘটনার সঠিক মর্ম অনুধাবনের বহিঃপ্রকাশ, হযরত হুসাইন রা. ও তার নানা রাসূলে খোদা সা. এর প্রতি মুহাব্বত ও আন্তরিকতার একমাত্র পরিচায়ক। তাই এই দিনে ত্যাগ চাই-চাই তাঁর আদর্শ অনুসরণ। মরসিয়া ক্রন্দন চাইনা-চাইনা জারি, কুসংস্কার।

গ. আশুরার দিনের শ্রেষ্ঠ আমল

উপরোল্লেখিত হাদীসের আলোকে আশুরার দিনের শ্রেষ্ঠ করণীয় কি হবে, তাও আমরা জানতে পেরেছি। আর তা হলো আশুরার রোযা। অপর হাদীসের দ্বারা প্রমাণ হয় যে, রমযান মাসের রোযা ফরয হওয়ার পূর্বে আশুরার রোযা মুসলমানদের উপর ফরয ছিল। পরবর্তীতে তা নফলে পরিণত হয়। হযরত জাবের রা. বর্ণনা করেন-

يأمرنا بصيام يوم عاشوراء، ويحثنا عليه ويتعاهد نا عنده ، فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا، ولم يتعاهدنا عنده

রাসূলুল্লাহ সা. আমাদেরকে আশুরার দিনে রোযা রাখার নির্দেশ দিতেন এবং এর প্রতি উৎসাহিত করতেন। এ বিষয়ে নিয়মিত তিনি আমাদের খবরাখবর নিতেন। যখন রমযান মাসের রোযা ফরয করা হল তখন আর আশুরার রোযার প্রতি নির্দেশ করেননি এবং নিষেধও করেননি। আর এ বিষয়ে তিনি আমাদের খবরাখবরও নেননি। (মুসলিম-হা: ১১২৮)

উক্ত হাদিসের আলোকে আশুরার রোযার শ্রেষ্ঠত্ব বুঝা যায়। কারণ এই রোযা এতো গুরুত্বপূর্ণ যে, ঐ সময়ে তা মুসলমানদের উপর ফরয ছিল। বর্তমানে এই রোযা যদিও নফল, কিন্তু অন্যান্য নফল রোযার তুলনায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

আশুরার রোযার ফজিলত:

রাসূলুল্লাহ সা. এই রোযা নিজে পালন করেছেন এবং উম্মতকে রাখার প্রতি নির্দেশ করেছেন তাই তার অনুসরণ করা ও নির্দেশ পালন করাই আমাদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও ফজিলতের বিষয়। এ ছাড়াও অসংখ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সা. আশুরার রোযার ফজিলত বর্ণনা করেছেন। কয়েকটি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

عن ابى هريرةؓ قال: قال رسول الله ﷺ افضل الصيام بعد شهر رمضان شهر ا لله المحرم۔

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন "রমযান মাসের রোযার পর সর্বোত্তম রোযা মুহাররম মাসে আশুরার রোযা।"(সুনানে কুবরা-হা:৮৪২১০

عن ابى قتادةؓ ان رسول الله ﷺ سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية۔

হযরত আবু কাতাদা রা. থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সা. কে আশুরার রোযার ফজিলত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, এই রোযা বিগত বছরের গুনাহ মুছে দেয়। (মুসলিম-হা: ১১৬২)

আশুরার রোযা কয়টি ও কখন:

মুসলিম শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত-

حين صام رسول الله ﷺ يوم عاشوراء وامر بصيامه ، قالوا : يارسول الله ! انه يوم تعظمه اليهود والنصارى ، فقال رسول الله ﷺ فاذا كان العام المقبل، ان شاء الله صمنا اليوم التاسع۔

মহানবী সা. যখন আশুরার দিনে রোযা রাখেন এবং অন্যদেরকেও রোযা রাখার নির্দেশ প্রদান করেন তখন সাহাবীগণ অবাক হয়ে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সা. ইহুদী-নাছারা তো এই দিনটিকে বড় দিন মনে করে! (আমরা যদি এই দিনে রোযা রাখি তা হলে তো এদের সঙ্গে সামঞ্জস্য হবে) তাদের প্রশ্নের উত্তরে রাসূল সা. বললেন (তারা যেহেতু এদিন একটি রোযা পালন করে) আগত বছরে ইনশাআল্লাহ এই ১০ তারিখের সঙ্গে ৯ম তারিখে মিলিয়ে দুই দিন রোযা পালন করবো। (মুসলিম হা:১১৩৪)

অপর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন-

صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود ، صوموا قبله يوما او بعده يوما۔

তোমরা আশুরার দিনে রোযা রাখো, তবে এ ক্ষেত্রে ইহুদিদের সঙ্গে মিল না হওয়ার জন্য ১০ তারিখের পূর্বের দিন অথবা পরের দিন আরো একটি রোযা রেখে নিও। (মুসনাদে আহমদ হা:২১৫৪)

উপরোক্ত হাদীসগুলোর আলোকে প্রমাণ হয় যে আশুরার রোযা হবে দুইটি : মুহাররমের ১০ তারিখে একটি, আর ৯ তারিখে অথবা ১১তারিখে আরো একটি।

বিধর্মীদের সামঞ্জস্য অবৈধ :

উপরোল্লেখিত হাদিসে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষণীয়। সাহাবায়ে কিরাম এবং রাসূল সা. বিধর্মীদের সঙ্গে কোনো ক্ষেত্রে মিল হোক তা মোটেও সমর্থন করতেন না। তাই যে দিনে বিধর্মীরা রোযা রাখতো সে দিনে তারা রোযা রাখার মতো বড় একটি ইবাদত হওয়াকেও পছন্দ করেননি। তাই এদের সঙ্গে গড়মিল হওয়ার সুন্দর একটি উপায় নির্ণয় করা হলো। তারা রোযা রাখবে একদিন আর মুসলমানগণ রোযা রাখবে দুই দিন। কিন্তু আমরা যারা আজ চলা-ফেরা, পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার, শিক্ষা-দীক্ষা তথা সর্বক্ষেত্রে বিধর্মীদের অনুকরণ করে চলেছি, মহানবী সা. এর মুহাব্বত আমাদের মধ্যে কী পরিমাণ আছে? আমরা কেমন আশেকে রাসুল? তা ভাবার সময় এসেছে।

আশুরার দিনে অন্যান্য আমল :

عن ابى هريرةؓ ان رسول الله ﷺ قال: من اوسع على عياله واهله يو م عاشوراء او سع الله عليه سائر سنة۔

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন যে ব্যক্তি আশুরার দিনে আপন পরিবার-পরিজনের মধ্যে পর্যাপ্ত খানা-পিনার ব্যবস্থা করবে, আল্লাহ পাক তার জন্য পূর্ণ বছর পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করে দিবেন। (তাবরানী, আবসাত হা: ৯৩০৩)

বেশ কয়েকজন সাহাবী থেকে এ হাদীসটি বর্ণিত হাদীসটি ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে কিছু মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম সুয়ূতী সহ অনেক বড় বড় ইমামগণের মতানুসারে হাদীসটি গ্রহণযোগ্য ও আমলযোগ্য। (জামেউস সাগীর ১০১৯)

অতএব কোন মুসলমান যদি উপরোক্ত হাদীসের উপর আমল করার উদ্দেশ্যে আশুরার দিন তাদের খানা-পিনায় উন্নত ব্যবস্থা করতে আগ্রহ করে তা হলে শরীয়তে অনুমতি আছে। তবে কোন ক্ষেত্রেই অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করাকে ইসলাম সমর্থন করে না।

আশুরার দিনে বর্জনীয় কাজ:

আশুরার দিনে উপরোল্লেখিত কয়েকটি আমল ব্যতীত অন্য কোনো নির্দিষ্ট আমলের অস্তিত্ব কুরআন হাদীসে নেই-নেই। এসব কাজের কোন বাস্তবতা। তাই খানা-পিনার নামে হালুয়া রুটির হৈ হুল্লোড়, তাযিয়া-মরসিয়া বা শোক মিছিল করা, আতশবাজী ও আলোক সজ্জা করা, উৎসব মেলা ক্রীড়া-কৌতুক ইত্যাদির আয়োজন সবই অপসংস্কৃতি ও কুসংস্কার। এগুলো আশুরার কোনো কর্ম নয়, নয় ইসলামের কোনো আদর্শ।

মেডিকেল সার্জারি : মাসায়েল ও আহ্কাম

মুফতী শাহেদ রহমানী

বিশ্বব্যাপী বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষতার ছোঁয়ায় মানব জীবনের ব্যাবহার্য প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নতি সাধিত হয়েছে। চিকিৎসা ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নয়। এক্ষেত্রেও ব্যাপক উন্নতি ও অগ্রগতি লক্ষনীয়। সাথে সাথে মানব দেহে সৃষ্ট নিত্যনতুন রোগের ধরণ চিকিৎসা বিজ্ঞানকে নিয়ে যাচ্ছে যতসব জটিল ও কঠিন পদ্ধতির দিকে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে যে সকল জটিল ও কঠিন পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা হয় তার একটি মেডিকেল সার্জারি। যেহেতু পদ্ধতিটি খুবই জটিল, মানব দেহে কাটা ছেঁড়া করা লাগে তাই অনেকে এবিষয়ে শরয়ী হুকুম কি তা জানতে চায়।

আজকের দরসে ফিকহে এ বিষয়ের কিছু দিক নিয়ে আলোচনা করা হলো।

একথা খুবই স্পষ্ট যে, শরীয়তে ইসলামিয়ায় চিকিৎসা বিজ্ঞানের শিক্ষা ও তার প্রয়োগকে শুধুমাত্র জায়েযই বলেনি বরং সুস্থ মানবতার ব্যাপক স্বার্থে এটিকে ফরজে কিফায়া বলেও আখ্যায়িত করেছে।

মানুষের অঙ্গপ্রতঙ্গ কাটা ছেঁড়া করা নাজায়েয এবং হারাম। কিন্তু অতীব প্রয়োজনের তাগিদে উলামায়ে কেরাম মেডিকেল সার্জারি করার শর্তসাপেক্ষ অনুমতি প্রদান করেছেন। পাঁচ প্রকারের অস্ত্রপাচারকে উলামায়ে কেরাম বৈধ বলে ফতওয়া দিয়েছেন।

১. অস্ত্রপাচার শুধু মাত্র রোগ নিরাময়ের জন্য হওয়া। সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য নয়।

২. অস্ত্রপাচার রোগ নির্ণয়ের জন্য হওয়া।

৩. প্রয়োজনের ক্ষেত্রে গর্ভবতি মেয়েদের সিজার করা।

৪. খতনার জন্য অস্ত্রপাচার করা।

৫. কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাটা বা বাঁকা হয়ে গেলে তা শুদ্ধ করার জন্য অস্ত্রপাচার করা।

মেডিকেল সার্জারির ধরণ ও প্রকার শরয়ী বিধানসহ :

১. Essullal Surgarry রোগের ধরণ যদি এমন হয় যে, যদি রুগীকে অস্ত্রপাচার করা না হয় তবে এই রোগ নিশ্চিত রুগীর জন্য মৃত্যু ডেকে আনবে। এই ধরনের রুগীর ক্ষেত্রে মেডিকেল সার্জারি অত্যাবশ্যক।

২. Esseulial Surgary রোগের ধরণ যদি এমন হয় যে, যদি অস্ত্রপাচার করা না হয় তবে রুগীর প্রাণনাশ ও রোগ বৃদ্ধির কোনো আশংকা থাকে না। শুধুমাত্র অসুস্থতা দূর করার জন্য অস্ত্রপাচার করা হয়। এ ধরনের অস্ত্রপাচার দু'প্রকার।

ক. রোগের দ্বারা রুগীর স্বল্প মেয়াদী অথবা দীর্ঘ মেয়াদী ক্ষতি হয়।

খ. এমন রোগ যার দ্বারা রুগীর বর্তমানে কোনো ক্ষতি নেই, তবে ভবিষ্যতে কোনো ক্ষতির নিশ্চিত আশংকা করা হয়।

এরূপ রুগীর জন্য অস্ত্রপাচার বৈধ।

৩. Minor Surgery এমন ধরনের রোগ যা নিরাময়ের জন্য অস্ত্রপাচারের কোনো প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ এই রোগের দ্বারা রুগীর মৃত্যু বা অঙ্গহানির কোনো আশঙ্কা নেই। তবে অস্ত্রপাচার না করলে রোগটি রুগীর অসহনীয় কষ্টের কারণ হয়। যেমন নাকের মধ্যে পলি অর্থাৎ গোশত বৃদ্ধি পাওয়া।

এমতাবস্থায়ও অস্ত্রপাচার করা বৈধ।

৪. Surgical Diagnosis রোগ নির্ণয়ের জন্য অস্ত্রপাচার করা। যদি অস্ত্রপাচার ব্যতীত রোগ নির্ণয়ের অন্যকোনো সহজ পন্থা না থাকে তবে অস্ত্রপাচার করা বৈধ। অন্যথায় নয়।

৫. Surgical Accouchment অস্ত্রপাচারের মাধ্যমে সন্তানকে মায়ের পেট থেকে বের করা চাই সন্তানটি সম্পূর্ণ হোক বা অসম্পূর্ণ। এই অস্ত্রপাচারটি দু'কারণে করা হয়।

ক. যদি সন্তান বা মা অথবা উভয়ের নিশ্চিত প্রণহানি আশংকা করা হয়। এ অবস্থায় অস্ত্রপাচার শরীয়ত মতে বৈধ।

খ. সন্তানের স্বাভাবিক জন্ম বাধাগ্রস্ত হলে অথবা অস্ত্রপাচার না করলে মা অথবা সন্তানের ক্ষতি হওয়ার আশংকা হলে অস্ত্রপাচারের বিষয়টি অভিজ্ঞ ডাক্তারের মতামতের উপর নির্ভর করবে। যদি ডাক্তার বলে তবে অস্ত্রপাচার করা বৈধ অন্যথায় নয়।

৬. Surgical Phimosiectomy যে অস্ত্রপাচার খতনার জন্য করা হয়। হানাফী মাযহাব মতে খতনা করানো সুন্নাত। তাই এই ধরনের অস্ত্রপাচার শুধু জায়েযই নয় বরং সুন্নাতও বটে।

৭. Surgical Anatomy চিকিৎসা শাস্ত্র অনুশীলনের জন্য মৃতের লাশে অস্ত্রপাচার করা। এধরনের অস্ত্রপাচার বৈধ ও অবৈধ হওয়ার ক্ষেত্রে উলামায়ে কেরামের ভিন্ন মত রয়েছে। আরব বিশ্বের উলামাদের একাংশ যেমন সৌদী সর্বোচ্চ উলামা পরিষদ, ইসলামী ফিক

একাডেমি মক্কা, জর্দানের জাতীয় ফতওয়া বোর্ড, জামিয়া আজহার মিশরের ফতওয়া বোর্ড এধরনের অস্ত্রপাচারকে বৈধ বলে ফতওয়া দিয়েছেন। পক্ষান্তরে উপমহাদেশ তথা বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতের উলামায়ে কেরামগণ এটিকে অবৈধ বলে ফতওয়া দিয়েছেন।

মেডিকেল সার্জারি কোনো কোনো সময় রুগীর মৃত্যু, অঙ্গহানির কারণ হয়ে থাকে। তাই উলামায়ে কেরাম মেডিকেল সার্জারির ক্ষেত্রে আটটি শর্ত আরোপ করেছেন।

১. সার্জারি শরীয়ত মত বৈধ হওয়া।

২. সার্জারি ছাড়া রোগ নিরাময়ের কোনো উপায় না থাকা।

৩. সার্জারি করার জন্য রোগীর অনুমতি প্রদান।

৪. সার্জেন্ট ও তার সহযোগীদের মধ্যে পরিপূর্ণ যোগ্যতা বিদ্যমান থাকা।

৫. সার্জারির দ্বারা রোগ নিরাময় হওয়ার ব্যাপারে সার্জেন্টের প্রবল ধারণা থাকা।

৬. সার্জারি ব্যতীত অন্য কোনো সহজপন্থা বিদ্যমান না থাকা।

৭. রুগীর কল্যাণ সার্জারিতেই নিহিত থাকা।

৮. সার্জারির দ্বারা রুগীর এমন কোনো ক্ষতি না হওয়া যা রোগের ক্ষতির চেয়েও ভয়াবহ।

সার্জারি সংক্রান্ত কতিপয় মাসআলা :

☆ যদি অভিজ্ঞ ডাক্তার অস্ত্রপাচারের কারণে রোগীর প্রাণহানীর প্রবল আশঙ্কা বোধ করেন তবে অস্ত্রপাচার করা শরীয়ত মতে হারাম হবে।

☆ রোগী অনুমতি প্রদানে অক্ষম হলে অভিভাবকদের অনুমতিই যথেষ্ট হবে।

☆ অস্ত্রপাচারের জন্য সার্জেন্টের পরিপূর্ণযোগ্যতার ক্ষেত্রে দু'টি শর্ত। ক.যে রোগের জন্য সে অস্ত্রপাচার করবে ওই রোগ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে অভিজ্ঞ, দক্ষ ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া। খ. সার্জেন্ট সঠিক ও সুষ্ঠু পন্থায় অস্ত্রপাচারে পুরোপুরি সক্ষম হওয়া।

☆ সার্জেন্ট অভিজ্ঞ ও দক্ষ হওয়া সত্বেও অস্ত্রপাচার সফল না হলে সার্জেন্ট দায়ী থাকবে না।

☆ রোগের কষ্ট ও ক্ষতির চেয়ে অস্ত্রপাচারের কষ্ট ও ক্ষতি বেশি হলে অস্ত্রাপাচার করা এবং করানো বৈধ হবে না।

Anesthesia বেহুঁশ করার বিধান :

শরীয়তে মানুষকে বেহুশ করা মূলত হারাম। কারণ বেহুশ করার দ্বারা সাময়িকভাবে তার হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়। তবে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে বেহুশ করাকে শরীয়ত বৈধ বলেছে।

ক. রোগীর অবস্থা যদি এমন হয় যে, বেহুশ করা ব্যতীত অস্ত্রপাচার করা সম্ভব নয়।

খ. বেহুশ করা ছাড়া অস্ত্রপাচার করাতো সম্ভব তবে রোগীর কঠিন কষ্ট হবে।

গ. বেহুশ করা ছাড়া অস্ত্রপাচার করাতো সম্ভব, রোগীর অসহনীয় কষ্টও হবে না। তবুও রোগীর সহজার্থে বেহুশ করা।

File C:\Users\Dhaka\Desktop\output poster for email2.jpg not found.

মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক্ব হক্কী হারদূয়ী (রহ.)-এর অমূল্য বাণী

১। হযরত হারদূয়ী (রহ.) বলেন, প্রত্যেক কাজ আঞ্জাম দেওয়ার জন্য তিনটি জিনিষের প্রয়োজন। সঠিক ইলম, আলো, শক্তি। পুরো জীবনের উদ্দেশ্যই হল জান্নাত হাসিল করা এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করা। সঠিক ইলমের শর্ত এজন্যই যে, ইলম সঠিক না হলে আমল নষ্ট হয়ে যায়। যেমন কোনো ব্যক্তি আসর নামাযের পর নফল পড়তে লাগল ইখলাসের সাথে, তাসত্ত্বেও এ আমল গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা এ আমল মাসআলা তথা শরয়ী নিয়ম পদ্ধতির পরিপন্থী। এতে বুঝা গেল ইখলাস শরীয়ত মোতাবেক হলে কবুল অন্যথায় কবুল হবে না। যেমন ত্রিশ রমাজানের রোযা রাখা জান্নাতের রাস্তা আর পহেলা শাওয়াল রোযা রাখা জাহান্নামের রাস্তা। কেননা পহেলা শাওয়াল- ঈদের দিন রোজা রাখা হারাম। এতে বুঝা গেল শুধু আমল করলে চলবে না বরং আমলের নিয়ম-নীতি জানতে হবে। বর্তমানে নেককারদের ঘরেও শরয়ী পর্দা দেখা যায় না। ইশরাকের নামায, তিলাওয়াত, তাহাজ্জুদ এবং যিকির আযকার তো গুরুত্বসহকারে জারি আছে। কিন্তু চাচি, মামী, ফুফাতো বোন, খালাতো বোন, মামাতো বোন এবং ভাবীর সাথে পর্দা করে না। স্বামীর ভায়ের সাথে অত্যন্ত কঠোরভাবে পর্দা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বামীর ভাইকে তো মৃত্যুর সাথে তুলনা করেছেন।

সঠিক ইলমের পর শক্তির প্রয়োজন আছে। আর তা হলো আধ্যাত্মিক শক্তি। অর্থাৎ আল্লাহ পাকের মুহাব্বত এবং ভয় এ দুটি জিনিসের দ্বারা নেক আমল করা এবং গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার শক্তি অর্জিত হয়। এ প্রসঙ্গে হযরত (রহ.) বলেন, আমার এক বন্ধু যিনি আলেম ছিলেন, আমাকে বললেন, আমরা কুদুরী, কাঞ্জ, শরহে বেকায়া, হিদায়া ইত্যাদি কিতাবসমূহ গ্রামাঞ্চলে জুমা নাজায়েয হওয়ার সবক পড়ে আসতে ছিলাম। কিন্তু আমলের তাউফিক হতনা গ্রামবাসীদের চাপের মুখে ভয়ে পড়ে নিতাম। বরং ইমামতি করে ফেলতাম। দীর্ঘ দিন পর হযরত শাহ আব্দুল কাদের রাইপুরী (রহ.) এর খিদমতে যখন আসা যাওয়া শুরু করলাম আল্লাহ ওয়ালার সোহবতের বরকতে অন্তরে শক্তি সঞ্চার হলো। এবং গ্রামাঞ্চলে জুমা পড়ানো ছেড়ে দিলাম। আট মাইল দূরে বড় জনবহুল অঞ্চলে গিয়ে জুমা পড়তে থাকি। এমনকি রমাজান মাসে রোযা রেখেও আট মাইল চলার তাওফিক হয়ে যায়। এক বৎসর এভাবে অতিবাহিত হয় যখন গ্রামের লোকেরা আমাকে ঘেরাও করে বলে যে, এ গ্রামের মধ্যেই আপনাকে ঈদ এবং জুমার নামায পড়তে হবে। আমি বললাম, কোনো অবস্থাতে আমি পড়বোনা। তখন তারা বললো, আপনিতো বিগত দিনে জুমা ও ঈদ এখানে পড়াতেন এখন পড়াবেন না কেন? তখন বললাম, আমার ভুল হয়ে গেছে আল্লাহ মাফ করুন, সমাজ এবং পুরা গ্রামবাসী নারাজ হতে পারে কিন্তু আমি আর আল্লাহ পাককে নারাজ করবো না। খাজা আজীজুল হাসান মজযুব (রহ.) বলেন–

سارا جہاں خلاف ہو پروانہ چاہئے
مدنظر تو مرضی جاناں چاہئے۔

এখন আমার সে বন্ধু হযরত শায়খুল হাদিস (রহ.) এর খলিফা। তাঁকে হযরত শায়খ (রহ.) নিজের জুববা দান করেছেন। যে ছাত্রের অন্তরে আল্লাহপাকের মুহাব্বত এবং ভয় দান করা হয় সে ইউনিভার্সিটিতে গেলেও আল্লাহ ওয়ালাদের পোষাক পরিধান করে সেখানকার কালচার এবং মেজরুটির সামনে নত ও ভিতিগ্রস্ত হয়না। কিন্তু এ অবস্থা তখন সৃষ্টি হবে যখন আল্লাহ পাকের মুহাব্বত বেশী বেশী হবে । আর আল্লাহ ওয়ালাদের সুহবত তথা সান্নিধ্য এবং ভালোবাসার দ্বারা।

نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا
دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔

ভ্রান্ত দলের প্রতিষ্ঠাতার সবাই জ্ঞানীঃ

হযরত (রহ.) বলেন যখন গাড়ী চলে তখন ড্রাইভারের পা ব্রেক এর উপর থাকে এবং গাড়ীর কান তথা হেন্ডেল ড্রাইভারের হাতে থাকে এভাবে গাড়ী সঠিক ভাবে চলে এবং সংঘর্ষ হয় না অনুরুপ ভাবে মুরিদের কাঁদের উপর যখন পীরের পা থাকে এবং মুরিদের কান পীরের হাতে থাকে তখন মুরিদ ও ঠিক ঠিক ভাবে চলে। যদি গাড়ীর উপর চালক না থাকে তখন সোজা রাস্তায়তো চলবে কিন্তু যখন চৌ রাস্তার মোড় আসবে তখন সংঘর্ষ হবে। অনুরুপভাবে যত ভ্রান্ত দল আছে সবের প্রতিষ্ঠাতা আলেমতো বটে কিন্তু তারা সবাই শায়খ তথা পথ-প্রদর্শক বিহীন তাই প্রথম প্রথম তো ভালো চলে কিন্তু যখন কোন মোড় বা চৌ রাস্তা আসে তখন এক্সিডেন্ট করে আত্মগৌরব বা অহংকারে লিপ্ত হয় তখন কারো কথা শুনেনা।

অনুবাদ : **মুফতী মুহাম্মদ সুহাইল**
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা।

মালফূযাতে

হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত (দামাত বারাকাতুহুম)

(হযরত ওয়ালা ফক্বীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান দামাত বারাকাতুহুম-এর বসুন্ধরা মারকাযের জামে মসজিদে ছাত্র-শিক্ষক ও সালেকীনের উদ্দেশে এবং বিভিন্ন মাহফিলে দেওয়া সমসাময়িক বিভিন্ন মাওয়ায়েয ও বয়ান থেকে সংগৃহীত)

☆ হযরত ওয়ালা ফক্বীহুল মিল্লাত দা:বা: বলেন, যে সব দোস্ত আহবাব গাড়ী নিয়ে নামায পড়ার জন্য আসেন প্রকৃতপক্ষে তারা তো গাড়ী নিয়ে বেহেশতের দিকেই আসেন।হযরত ওয়ালা হারদুঈ (রহ.) বলতেন, "তুমি গাড়ী নিয়ে সফর কর, হাট-বাজার ও অফিস-আদালতে যাও, তাহলে গাড়ী নিয়ে বেহেশতের দিকে যাও না কেন?" দুনিয়ার বেহেশত হল মসজিদ। কারণ, সবচেয়ে উত্তম স্থান হল বেহেশত আর দুনিয়ার মধ্যে সর্বোত্তম জায়গা হল মসজিদ। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

احب البلاد الى الله مساجدها وابغض البلاد الى الله اسواقها، (رواه الامام مسلم فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب فضل الجلوس فى مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد ، رقم الحديث ٦٧١)

"আল্লাহ তা'আলার কাছে সবচেয়ে প্রিয়তম স্থান হল মসজিদসমূহ আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্থান হল বাজার। " অতএব, মসজিদ দুনিয়ার বেহেশত। বেহেশতের যেমন স্তরভেদ আছে, আটটি বেহেশত আছে। (তন্মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরের হল "জান্নাতুল ফেরদাউস" এজন্য আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে তা চাই)তেমনিভাবে মসজিদের ও স্তরভেদ আছে। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মসজিদ হল মসজিদে হারাম অতঃপর মসজিদে নববী তারপর মসজিদে আক্বসা।এরপর যে মসজিদে বেশী নামাযী নামায আদায় করে তা উত্তম হবে ঐ মসজিদ থেকে যার মুসল্লিসংখ্যা কম। যে মসজিদে ওলামায়ে কেরাম নামায পড়ে তা উত্তম হবে ওই মসজিদ থেকে যেখানে গাইরে আলেম নামাযী বেশী, তাই যে সব নামাযী ভাইয়েরা এখানে (মারকায মসজিদে) নামায পড়তে আসেন তারা অতিরিক্ত সওয়াব ও ফজীলতের অধিকারী হবেন।

* ইরশাদ করেন, যাদের ব্যক্তিগত গাড়ী আছে তারা নিজ গাড়ী নিয়ে মসজিদে আসতে পারেন। যাদের নিজস্ব গাড়ী নেই তারা তো ভাড়ার গাড়ী নিয়ে বাজারে যান। কাজ কারবার করেন এবং সফর করেন তাই তারা ভাড়া গাড়ী নিয়ে মসজিদে গেলে তা বেহেশতের দিকে যাওয়া হবে।

* ইরশাদ করেন, বুদ্ধিমান বালেগ পুরুষের নামায মসজিদে পড়া জরুরী। হাদীস শরীফে এসেছে,

لاصلاة لجار المسجد الا فى المسجد

মসজিদের প্রতিবেশীর নামাযের ব্যাপারে বলা হয়েছে "লা"। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার কাছে ওই নামায নামায-ই নয় যে ব্যক্তি মসজিদের প্রতিবেশী হয়েও মসজিদে নামায পড়ে না। আল্লাহ তা'আলার কাছে সে নামাযী হিসেবে গণ্য নয় তবে দুনিয়াতে তাকে নামাযী বলা হবে।

* ইরশাদ করেন, মসজিদ ক্বিয়ামত পর্যন্ত মসজিদ হিসেবে নির্দিষ্ট থাকবে যদিও তাতে কেউ নামায না পড়ে । পক্ষান্তরে, এমন কোন জায়গা যা মসজিদের জন্য ওয়াকফ করা হয়নি তাতে প্রত্যেক ওয়াক্ত নামায জামাতের সাথে আদায় করা হলেও তা মসজিদ হিসেবে গণ্য হবে না। তবে উক্ত জায়গাকে নামাযের স্থান বলা হবে। সৌদি আরবের লোকেরা অফিস-দোকান ইত্যাদিতে নামায পড়ার জন্য একটি জায়গা নির্দিষ্ট করে রাখে যাকে তারা مصلى বলে থাকে। যদি কোন ব্যক্তি মসজিদ নির্মাণ পূর্বক কোন স্থান ওয়াকফ করে দেয় আর এলাকাবাসী হিংসা বা শত্রুতার কারণে সেখানে নামায না পড়ে তারপরও তা মসজিদ হিসেবে গণ্য হবে। চাই তাতে এক ব্যক্তিও নামায না পড়ুক।

* ইরশাদ করেন, বড়ই আফসোসের বিষয়! বর্তমানে পুরুষের মসজিদের পার্শ্বে মহিলাদের মসজিদ নির্মাণ করা হচ্ছে। অথচ হুজুরে পাক সা. ইরশাদ করেন,

خير مساجد النساء قعر بيوتهن (مسند احمد٦ /٢٩٧رقم الحديث ٢٦٥٤٢، صحيح ابن خزيمة رقم الحديث ١٦٨٣)

মহিলাদের জন্য উত্তম মসজিদ হল তাদের অন্দর মহলের আভ্যান্তরীণ অংশ। অন্য হাদীসে এসেছে,

عن ام حميد امرأة ابى حميد الساعدى انها جاء ت النبى ﷺ فقال: يارسول الله انى احب الصلاة معك؟ قال قد علمت انك تحبين الصلاة معى، وصلاتك فى بيتك خيرلك من صلاتك فى حجرتك، وصلاتك فى حجرتك خير من صلاتك فى دارك، وصلاتك فى دارك خيرلك من صلاتك فى مسجد قومك، وصلاتك فى مسجد قومك خير لك من صلاتك فى مسجدى، قال فامرت فبنى مسجد فى اقصى شئ من بيتها واظلمه فكانت تصلى فيه حتى لقيت الله عزوجل (مسند احمد ٣٧١/٦ رقم الحديث ٢٧٠٩٠، صحيح ابن حبان رقم الحديث ٢٢١٧، صحيح ابن خزيمة رقم الحديث١٦٨٩)

হযরত আবু হুমাইদ সায়ে'দী রা. এর বিবি উম্মে হুমাইদ রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি আপনার সাথে নামায

পড়তে ভালবাসি । নবীজী বলেন, আমি জানি তুমি আমার সাথে নামায পড়তে ভালবাস। অথচ তোমার বাড়ির অন্দর মহলে নামায পড়া বাইরের কামরায় নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। আর বাইরের কামরায় নামায পড়া বারান্দায় নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। আর তোমার ঘরের বারান্দায় নামায পড়া মহল্লার মসজিদে নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। আর তোমার মহল্লার মসজিদে নামায পড়া আমার এই মসজিদে নামায পড়া উত্তম। বর্ণনাকারী বলেন, মহিলা সাহাবী নবীজীর এ'কথা শুনে ঘরের একদম অন্দর মহলে ও সবচেয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানে মসজিদ (নামায পড়ার জায়গা) তৈরী করতে বললেন। তৈরী হওয়ার পর মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই নামায পড়েছেন।

এখন চিন্তা ভাবনার বিষয় হলো, যেখানে মসজিদে নববীতে নামায পড়লে ১হাজার গুণ সওয়াব পাওয়া যায় মতান্তরে , পঞ্চাশ হাজার গুণ সওয়াব পাওয়া যায়। সেই মসজিদে নামায পড়ার চেয়ে মহিলাদের জন্য ঘরের অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রকোষ্ঠে একাকী নামায পড়লে অনেকগুণ সওয়াব বেশী পাওয়ার কথা বলা হয়েছে সে ক্ষেত্রে প্রশ্ন জাগে, মহিলাদের জন্য মসজিদ তৈরী এবং মহিলাদের মসজিদে যাওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী হওয়ার কারণটা কী? যদি সওয়াব বেশী পাওয়ার আকাংখায় হয় তাহলে মসজিদে কেন যাবে?

অতএব, স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল, সওয়াব বেশী পাওয়ার উদ্দেশ্যে নয় বরং অন্য কোনো উদ্দেশ্যে মহিলারা মসজিদে যেতে চায়।

(রমাজানুল মোবারক- ১৪২৩ হিজরী)

* ইরশাদ করেন, সালেকীন তথা মুরীদগণের জন্য কলবের হেফাজতের প্রতি দৃষ্টি দেয়া খুবই জরুরী

* ইরশাদ করেন, সালেকের উন্নতির জন্য শায়খের সাথে মুনাসেবত (মিল) জরুরী। মুনাসবত কীভারে তৈরী হবে? আপন কলবী হালতের اطلاع শায়খ এর কাছে পেশ করতে হবে, অতঃপর শায়খের মাশওয়ারার উপর আমল করতে হবে। اتباع (অনুসরণ) انقياد (নিজের মনচাহত জীবন বাদ দিয়ে শায়খের সিদ্ধান্ত মতে চলার দৃঢ় ইচ্ছা) থেকে হয়।

আর اعتقاد হয় انقياد এর ভিত্তিতে। হযরত খাজা আযীযুল হাসান মজযূব রহ. বলেন,

چار چیزیں لازمی ہیں استفادہ کیلئے
اطلاع واتباع اعتقاد وانقیاد

আপন শায়খ ও মুরশিদ থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য চারটি জিনিষ নিতান্ত জরুরী।

১. اطلاع মুরীদের আপন কলবী হালত ও অবস্থা শায়খকে জানানো।

২. اتباع শায়খ হালত জানার পর যেই পরামর্শ দিবেন তা পুরোপুরি মেনে চলার চেষ্টা করা

৩. اعتقاد শায়খের প্রতি এই অগাধ আস্থা ও বিশ্বাস থাকা যে, আমি শায়খের নির্দেশনা অনুযায়ী চললে আমার تعلق مع الله (আল্লাহ তা'আলার সাথে বিশেষ সম্পর্ক) হাসিল হবে।

৪. انقياد মুরিদ শায়খের মন-মানসিকতা ও চাহিদা বাস্তবায়ন করার প্রতি সদা সর্বদা আন্তরিকভাবে তৈরী থাকবে।

সুলূক ও তরীকতের রাস্তা অতিক্রম করার জন্য বায়আত শর্ত নয় তবে মুনাসবত শর্ত। হ্যাঁ, বায়আত হওয়ার দ্বারা মাশায়েখের সিলসিলায় অন্তর্ভুক্তি হয়। ফলে বায়আত গ্রহনকারীর প্রতি সিলসিলার সমস্ত মাশায়েখের রুহানী ফুয়ুজাত متوجه (ধাবিত) হয়। ইমাম রাজী (রহ.) এর মৃত্যুর প্রাক্কালে যখন আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব সম্পর্কে ইবলীসের সাথে তর্ক হচ্ছিল তখন উনার শায়খের গায়েবানা উপদেশ আসে যে, বলে দাও, "বিনা দলীলে আল্লাহ এক।"

* ইরশাদ করেন, মাদরাসার উস্তাদ ঠিক করার সময় দেখা চায়, তিনি তাহাজ্জুদ নামায পড়তে অভ্যস্ত কি না? যদি অভ্যস্ত না হয় কমপক্ষে ওয়াদা হলেও নেওয়া চায়। সাথে সাথে উস্তাদ আল্লাহ ওয়ালা কিনা তা যাচাই করে দেখা চায়।

* ইরশাদ করেন, উস্তাদ যখন দরসে থাকবে তখন শিক্ষকের ভুমিকা পালন করবে আর যখন দরসের বাইরে থাকবে তখন খানকাহী জিন্দেগী অবলম্বন করবে। আজান হওয়ার সাথে সাথে মসজিদে চলে যাবে। যদি কিতাব পড়া লাগে তাও মসজিদে পড়বে।

* ইরশাদ করেন, আসাতিযায়ে কেরাম তালেবে এলমদেরকে সুন্নাতের অনুসরণ ও গোনাহ ছেড়ে দেওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করবে। আল্লাহ ওয়ালা উস্তাদদের কাছে উঠা বসার প্রতি উৎসাহিত করবে।

* আযানে اللـه اكبر এর দুই বাক্যকে মিলিয়ে পড়ার ব্যাপারে ইরশাদ করেন, অভিজ্ঞ কারী সাহেবের কাছে মশক করা ছাড়া প্রথম الله اكبر এর 'র' এর মধ্যে ساكن সাকিন পড়লে فصل হয়। আর মশক ছাড়া وصـــل করলে (মিলিয়ে পড়লে) حـــركـــت(যবর) হয়। যদি ساكن আদায় করে وصل করা সম্ভব না হয় তখন فصل না করে যবরের সাথে (ر এ যবর দিয়ে) وصـــل করা উত্তম । তারপরও যেন فصل না হয়।

*ইরশাদ করেন, নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় মাথা সোজা থাকার জন্য নজর সিজদার জায়গায় আর চেহারা কেবলামুখী হওয়া চাই।

* ইরশাদ করেন, পুরুষগণ দু' পায়ের মাঝখানে কমপক্ষে চার আঙ্গুল ফাঁক রাখবে। এর চেয়ে কম হলে মহিলাদের সাথে মিল হয়। তবে চার আঙ্গুলের চেয়ে বেশী ফাঁক রাখা যাবে কিনা? এর জবাব হল, প্রয়োজনে ফাঁক বেশী রাখা যাবে। বলেন, লামাযহাবীদের দাড়াঁনো সুন্নতের বরখেলাফ।

সারকথা, নামাযে দাঁড়ানোর সুন্নাত পদ্ধতি হল, চেহারা কেবলামুখী থাকবে, নজর সিজদার স্থানে থাকবে, পায়ের পাতা সোজা থাকবে ও মহিলাদের দাঁড়ানোর মত হবে না।

* বলেন, একটি সুন্নাতও যদি ছেড়ে দেয়া হয় তখন আল্লাহ ওয়ালা হওয়া যাবে না। নামাযে ৫১টি সুন্নাত আছে। সব সুন্নত যদি ছেড়ে দেয়া হয় নামাযী কেমনে হওয়া যাবে? হ্যাঁ, নামাযীর বেশ ধারণ করেছে বলা হবে। সুন্নাতের প্রতি যত্নবার হলেই প্রকৃত নামাযী হওয়া যাবে।

গ্রন্থনায় :

মাওলানা মুহাম্মদ লোকমান

"সিরাতে মুস্তাকীম" বা সরলপথ-৪

মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক্ব

নমূনা : ৩

একবার এক গোত্রের কিছু লোক এসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এর নিকট জানতে চাইল, জনাব! আমাদের এক ব্যক্তি বিবাহ করেছে, কিন্তু মহর নির্ধারণ করেনি। তারপর সে তার স্ত্রীর সঙ্গে সহবাসের পূর্বেই ইন্তিকাল করেছে। এখন তার মহরের ব্যাপারে কি ফায়সালা হবে? হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) বললেন, নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর আমার নিকট এর চেয়ে জটিল কোনো সমস্যা উপস্থিত হয় নি। তোমরা এ ব্যাপারে অন্যদেরকেও জিজ্ঞাস কর। তারপর ব্যাপারটি নিয়ে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে একমাস পর্যন্ত আলোচনা চলতে থাকে। পরিশেষে তাঁরা আবারও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এর দারস্থ হয়। তিনি তাদেরকে বললেন, আমি আমার রায় দ্বারা ইজতিহাদ করে সমাধান দিচ্ছি। সঠিক হলে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে আর ভুল হলে আমার ও শয়তানের পক্ষ হতে। এ ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল দায়মুক্ত। অতঃপর তিনি সকলের সামনে তাঁর ইজতিহাদ তুলে ধরলেন যে, এ মহিলা মহরে মিছিল পাবে। তার মৃত স্বামীর ওয়ারিশ হবে এবং চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করবে। এ ফায়সালা শোনার পর তৎক্ষণাৎ এক ব্যক্তি বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনার সিদ্ধান্ত আল্লাহ ও রাসূলের সিদ্ধান্তের সঙ্গে মিলে গেছে। আমাদের গোত্রীয় বিরওয়া বিনতে ওয়াসিক নাম্নী এক মহিলার ব্যাপারে স্বয়ং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) স্বীয় কিয়াস সহী হওয়ার দলীল জানতে পেরে এত বেশি খুশি প্রকাশ করলেন যে, ইসলাম গ্রহণের পর তিনি এতোটা আনন্দ কখনো প্রকাশ করেন নি। (উসূলুল জাসসাস ২/২৩০)

নমূনা : ৪

ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রা.) এর খলীফা নিযুক্ত করণের বিষয়টিও সাহাবায়ে কেরামের ইজতিহাদ দ্বারা হয়েছিল। কেননা কুরআন হাদীসের কোথাও একথা নেই যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পর তিনিই সর্বপ্রথম খলীফা হবেন। (উসূলুল জাসসাস ২/২৩০)

শরীয়তে ইসলামিয়ায় এজাতীয় আরও বহু মাসআলা রয়েছে যেগুলো সাহাবায়ে কেরামের কিয়াস ও ইজতিহাদ দ্বারা গৃহীত হয়েছে।

নিম্ন বর্ণিত সাহাবায়ে কেরাম কিয়াস ও ইজতিহাদের ক্ষেত্রে অগ্রণীভূমিকা পালন করেছেন:

১. হযরত উমর (রা.)। ২. হযরত আলী (রা.)। ৩. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) ৪. উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (রা.) ৫.যায়দ ইবনে সাবিত (রা.) ৬. আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রা.) ৭. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)। এর পরবর্তী ছিলেন, ১. হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ২. হযরত উম্মে সালামা (রা.) ৩. উসমান ইবনে আফফান (রা.) ৪. আনাস ইবনে মালেক (রা.) ৫. আবু সাঈদ খুদরী (রা.) ৬. আবু হুরায়রা (রা.) ৭. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা.) ৮. আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) ৯. আবু মুসা আশআরী (রা.) ১০. সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) ১১. সালমান ফারেসী (রা.) ১২. মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) ১৩. তালহা (রা.) ১৪. যুবাইর (রা.) ১৫. আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) ১৬. মু'আবিয়া (রা.) প্রমূখ ব্যক্তিবর্গ।

সাহাবাযুগের কিয়াস ও ইজতিহাদ সংক্রান্ত উপর্যূক্ত প্রামাণ্য আলোচনা থেকে স্পষ্ট হল, কিয়াস ও ইজতিহাদ ভূঁইফোড় কোনো বিষয় নয়। বরং তা শরীয়তের দলীল চতুষ্টয়ের অন্যতম। এব্যাপারে সংশয় পোষণ করা গোমরাহী ও ইলমী দৈন্যের পরিচায়ক। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কিয়াস অস্বীকারের গোমরাহী থেকে হিফাজত করুন। আমীন।

সাহাবাযুগের তাকলীদঃ

সাহাবায়ে কেরাম (রা.) উম্মতের জন্য দ্বীন পালনের নমুনা ও মাপকাঠি। তারা যেভাবে কুরআন সুন্নাহর উপর আমল করেছেন, সফলতা পেতে হলে উম্মতকে সেভাবে পথ চলতে হবে। বলা বাহুল্য সাহাবায়ে কেরাম সকলে ইলমে দ্বীন চর্চাকে নিজের পেশা বানাননি। তারা বিভিন্ন ধরনের দ্বীনী ও দুনিয়াবী কাজে ব্যস্ত থাকতেন। অল্পসংখ্যক সাহাবায়ে কেরামই ইলম চর্চাকে নিজের পেশার মত বানিয়ে নিয়েছিলেন। সাধারণ নিয়মও এই যে, সকল মানুষ একই ধরনের পেশা ও কাজ অবলম্বন করেন না। প্রয়োজন অনুপাতে বিভিন্নজন বিভিন্ন কাজে মশগুল হবে। যাতে দ্বীন দুনিয়ার যাবতীয় বৈধকাজের ধারা সচল থাকে। এ জন্যই দেখা যায় পৃথিবীতে সকলেই এক জাতীয় পেশা গ্রহণ করে না। একেক জন একেক বিষয়ে

জ্ঞানার্জন করে ও বিশেষজ্ঞ হয়। আর অন্যরা সে ব্যাপারে তাকে মেনে চলে ও তার থেকে উপকৃত হয়। এটা এমন এক নিয়ম যার কোনো ব্যত্যয় নেই।

সাহাবায়ে কেরামও এই নিয়মের আওতার বহির্ভূত ছিলেন না। সে হিসেবে সাহাবায়ে কেরামের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক সাহাবী ইলমে দ্বীন চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তারা কুরআনে কারীম এবং নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হাজার হাজার হাদীস মুখস্ত করে ছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে তারা কারী, হাফেজে কুরআন, মুহাদ্দিস, মুফাসসির ও মুফতী নামে পরিচিত ছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের সার্বিক ব্যাপারে তারাই সিদ্ধান্ত দিতেন। যে ব্যাপারে কুরআন হাদীসে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা থাকতো তারা সেক্ষেত্রে সরাসরি কুরআন হাদীস থেকে ফায়সালা দিতেন। কুরআন হাদীসে পাওয়া না গেলে নিজ নিজ ইজতিহাদ ও কিয়াস দ্বারা তার সমাধান দিতেন। অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম বিনাবাক্যতে তাদের সিদ্ধান্ত অনুসরণ (তাকলীদ) করতেন। সকল ক্ষেত্রে তাদেরকে ফায়সালাকারী মানতেন এবং তাদের পরামর্শ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতেন।

লক্ষ্য করলে দেখা যায় ফিকহী মাযহাব সাহাবায়ে কেরামের যুগেই বিদ্যমান ছিল। তবে তা শাস্ত্র আকারে সংকলিত ছিল না। মনে রাখতে হবে কোনো বিষয় শাস্ত্র আকারে সংকলিত না হওয়া তার অস্তিত্বহীনতার প্রমাণ নয়। উদাহরণত: কুরআন অবতরণের যুগে আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্র আকারে সংকলিত ছিল না কিন্তু কুরআন নাযিলের শতশত বছর পূর্বে থেকেই আরবগণ ব্যাকরণ সম্মত আরবীতে কথা বলে ও সাহিত্য চর্চা করে এসেছেন। যাহোক কিছু সংখ্যক সাহাবী ছিলেন মাযহাবের ইমাম আর অন্যান্যরা তাদের ফিকহী মতামত অনুসরণ করে চলতেন। অর্থাৎ তারা ইমাম সাহাবীদের তাকলীদ করতেন।

এ ব্যাপারে ইমাম বুখারী (রহ.) এর বিশিষ্ট উস্তাদ ইমাম আলী ইবনুল মদিনী (রহ.) এর বর্ণনা দেখুন। তিনি তার এক রচনায় সেসব ফকীহ সাহাবীর আলোচনা করেছেন যাদের শিষ্যগণ তাদের মতামত ও সিদ্ধান্তগুলো সংরক্ষণ করেছেন। আর তাদের মাযহাব ও তরীকার উপর আমল ও ফতওয়া চালু ছিল। তিনি বলেছেন, সাহাবায়ে কেরামের মধ্য এ ধরনের ব্যক্তি ছিলেন ১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) ২. হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) ৩. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)

এরপর হযরত আলী ইবনুল মদিনী (রহ.) তাদের প্রত্যেকের মাযহাব অনুসরণকারী ও সে মোতাবেক ফতাওয়া প্রদানকারী ফকীহ তাবেয়ীদের নাম উল্লেখ করে বলেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা.) এর যে শিষ্যগণ তার কিরাআত অনুযায়ী লোকদেরকে কুরআন শেখাতেন তার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফতাওয়া দিতেন এবং তার মাযহাব অনুসরণ করতেন তারা হলেন, ১. হযরত আলকামা (রহ.) ২. হযরত আসওয়াদ (রহ.) ৩. হযরত মাসরূক (রহ.) ৪. হযরত আবীদাহ (রহ.) ৫. হযরত আমের ইবনে শুরাহবিল (রহ.) ৬. হযরত হারিস ইবনে কায়স (রহ.) প্রমূখ।

অত:পর ইবনুল মদিনী বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা.) এর ফকীহ শিষ্যদের সম্পর্কে ও তাদের মাযহাব বিষয়ে পরবর্তিদের মধ্যে সর্বাধিক বিজ্ঞ ছিলেন, ইবরাহীম নখয়ী ও আমের ইবনে শুরাহবিল।

তারপর তিনি হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রহ.) এর মাযহাবের অনুসারী ও তার সিদ্ধান্তসমূহ সংরক্ষণকারী ও তদানুযায়ী ফতওয়া প্রদানকারী বারোজন ফকীহের নাম উল্লেখ করে বলেন, এদের মধ্যে যায়েদ ইবনে সাবিতের মাযহাব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন ইবনে শিহাব যুহরী, ইয়াহইয়া ইবনে যায়দ আনসারী, আবু যিনাদ ও আবুবকর ইবনে হাযম। অত:পর তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস এর মতামত সংরক্ষণকারী ও তার প্রচার প্রসারকারীদের নাম উল্লেখ করেন। (কিতাবুল ইলাল ১৩৫-১৫৭)

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে, একবার মদীনা শরীফ থেকে কিছু লোক হজ্ব করতে মক্কা শরীফ এসেছিল। বিদায়ের সময় তাদের এক মহিলা বিদায়ী তওয়াফের পূর্বেই ঋতুমতী হয়ে পড়ে। তারা মক্কার মুফতী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এর নিকট ফতাওয়া জানতে চান। তিনি ফতওয়া দিলেন, এই মহিলার বিদায়ী তাওয়াফ মাফ হয়ে যাবে। তারা বলল, আমাদের মদীনার মুফতী যায়দ ইবনে সাবিত তো বলেন, এধরনের মহিলা পবিত্র হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে অত:পর বিদায়ী তাওয়াফ করে দেশে ফিরে যাবে। আমরা তার মতামত কিভাবে উপেক্ষা করব। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) তাদেরকে বললেন, তোমরা মদীনার উম্মে সুলাইমকে গিয়ে জিজ্ঞেস কর। নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর এক স্ত্রী হযরত সফিয়্যা (রা.) এ অবস্থার সম্মুখীন হলে তিনি তাকে আমার মতই সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন। (সহীহুল বুখারী, কিতাবুল হজ্ব হাদীস নং ১৭৫৮, ১৭৫৯)

মদীনা শরীফের উক্ত হাজীদের এ মন্তব্য সবিশষে লক্ষ্যনীয় যে, আমরা কিভাবে যায়েদ ইবনে সাবিতের মতামত উপেক্ষা

করবো" এই মন্তব্য একথার সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, তারা সর্বব্যাপারে হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) এর মাযহাবের (সিদ্ধান্তসমূহ) তাকলীদ করতেন।

এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট হল, তাকলীদের বিষয়টি সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে পুরোপুরি বিদ্যমান ছিল। আর থাকবেনাই বা কেন, তারাতো নিজেদেরকে ডক্টর আর আযহারী মনে করতেন না। তারা চাইতেন যে ব্যাপারে নিজেদের জানা নেই তা বিজ্ঞ ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের থেকে জেনে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করি। এভাবে আমল করাকে তারা সৌভাগ্য জ্ঞান করতেন। কারণ তারা ছিলেন প্রকৃতই সত্যের অনুসন্ধানী। আর বর্তমানের গাইরে মুকাল্লিদ ভাইদের কাণ্ডকারখানা নিয়ে তাদের প্রখ্যাত ইমাম নাওয়াব সিদ্দীক হাসান খান কত সুন্দর বলেছেন, বর্তমান যামানায় গাইরে মুকাল্লিদ (আহলে হাদীস) ভাইদের না আছে সঠিক পথ লাভ করার চিন্তাভাবনা, আর না আছে সঠিক জ্ঞানের অনুসন্ধান।" তারা শুধু সরলমনা সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে দুচারটি ফিকহী মাসআলা প্রচার করে তাদের বিভ্রান্ত করছেন। (আল হিত্তাহ ফি যিকরিস সিহাহ সিত্তাহ এর ভূমিকা পৃ: ১৫৩)

আল্লাহই ভালো জানেন এতে তাদের কি লাভ? মুসলমানদের ইজতিমায়ী জীবনে ফাটল ধরানো তো দ্বীনের মারাত্মক ক্ষতি। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এসব ফিতনা থেকে নিরাপদ রাখুন।

তাবেঈ ও তাবেতাবেঈদের যুগে কিয়াস, ইজতিহাদ ও তাকলীদ :

নবী (সল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম) এর যুগ ও সাহাবাযুগের কিয়াস, ইজতিহাদ ও তাকলীদ নিয়ে আলোচনার পর আমরা তাবেঈ ও তাবে তাবেঈদের যুগের কিয়াস ইজতিহাদ ও তাকলীদ নিয়ে আলোচনা করতে চাই। যাতে খাইরুল কুরুনের গোটা সময় কিয়াস ইজতিহাদ ও তাকলীদের উপস্থিতি আমাদের সামনে স্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হয় এবং তাকলীদ অস্বীকারে গোমরাহী থেকে বেঁচে থাকা সহজ হয়।

স্বয়ং নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে কিয়াস ও ইজতিহাদ জারি করে গিয়েছিলেন, সাহাবাযুগ হয়ে তা তাবেঈ ও তাবে তাবেঈদের সময়ও হুবহু বরং আরও বেগবান হয়ে অব্যাহত থকে। নিম্নে তার কিছু প্রমাণ পেশ করা হলো।

১। বিশিষ্ট তাবেঈ হযরত শুরাইহ (রহ.) থেকে বর্ণিত, হযরত উমর (রা.) তাঁর নিকট প্রেরিত এক পত্রে লিখেছেন, যখন তোমার সামনে কোনো সমস্যা উত্থাপিত হবে, তুমি কিতাবুল্লাহ থেকে তার সমাধান দিবে। কিতাবুল্লাহয় না পেলে নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সুন্নাহ থেকে সমাধান দিবে। যদি সুন্নাহর মধ্যেও সমাধান না পাও তাহলে সাহাবায়ে কেরামের ইজমা দ্বারা সমাধান দিবে। যদি কিতাব, সুন্নাহ ও ইজমায়ে সাহাবায়ও সমাধান না পাও তাহলে তোমার ইজতিহাদ অনুযায়ী সমাধান দিয়ে দিবে। অন্য বর্ণনা অনুযায়ী তিনি বলেছেন, তাহলে তোমার ইচ্ছা ইজতিহাদ করেও ফায়সালা দিতে পারো কিংবা বিরতও থাকতে পার। এটাই তোমার জন্য নিরাপদ পন্থা। (সূত্র জামিউ বয়ানিল ইলমি ওয়া ফাজলিহী ২/৭৪৬, দারেমী ১/৪৬)

২। তাবেঈ হযরত আবু আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ (রহ.) থেকে বর্ণিত, একবার হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এর নিকট বহুসংখ্যক সাহাবী ও তাবেঈ সমবেত হন। তিনি তাদেরকে উপরিউক্ত উপদেশ প্রদান করেন এবং বলেন, ইজতিহাদ করতে গিয়ে কেউ সন্দেহমূলকভাবে কিছু বলতে পারবে না। যেমন: আমার মনে হয় বা আমার ভয় হয় এজাতীয় শব্দ বলবে না। যা বলার সুস্পষ্টভাবে বলবে। কারণ হালাল-হারাম স্পষ্ট বিষয়। (দারেমী ১/৪৬, জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাজলিহী হাং নং ১৫৯৭)

অন্য রেওয়ায়াতে আছে, তিনি বলেছেন, আর যদি (ইজতিহাদের মূলনীতি না জানার কারণে) কেউ ইজতিহাদ না করতে পারে তাহলে তা স্বীকার করতে সে যেন লজ্জাবোধ না করে।

৩। ইমাম আওযায়ী (রহ.) বলেন, আমি ইমাম যুহরী (রহ.) এর নিকট শুনেছি, বিশুদ্ধ কিয়াস ইলমে দ্বীনের উত্তম সাহায্যকারী। (জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাজলিহী হাদীস নং ১৬১৫)

৪।আবু সালামা ইবনে আব্দুর রহমান (রহ.) বিশিষ্ট তাবেঈ হাসান বসরী (রহ.)কে জিজ্ঞেস করলেন, জনাব! আপনি লোকজনের মাসআলা মাসাইলের কিভাবে সমাধান দেন; সব বিষয়ই কি সাহাবীদের থেকে শোনা কথা, নাকি এ ব্যাপারে ইজতিহাদও করে থাকেন? হাসান বসরী (রহ.) উত্তরে বললেন, আল্লাহর শপথ আমাদের সব ফতাওয়াই সাহাবীদের থেকে শোনা নয় বরং অনেক ক্ষেত্রেই আমরা ইজতিহাদ করে মানুষের জন্য অধিক কল্যাণকর পথ খুঁজে বের করি যা তারা নিজেরা বের করতে পারে না। (জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাজলিহী হাদীস নং ১৬১৯ তাবাকাতু ইবনে সা'দ ৭/১৬৫)

৫। হযরত হাম্মাদ (রা.) বলেন, আমি ইবরাহীম নাখয়ীর চেয়ে উপস্থিত ইজতিহাদে যোগ্যতাবান আর কাউকে দেখিনি। (জামিউ বয়ানিল ইলমি ওয়া ফাজলিহী হাদীস নং ১৬২০)

৬। হযরত রাবী'আহ (রহ.) একবার ইমাম যুহরী (রহ.)কে জিজ্ঞেস করেন কোনো ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হলে আপনি কিভাবে তার উত্তর দেন? তিনি বলেন, আমি প্রথমে নবীজী (সা.) এর হাদীস দ্বারা জবাব দেই, সেখানে না পেলে সাহাবীদের বক্তব্য দ্বারা দেই তাতেও না পাওয়া গেলে ইজতিহাদ করে উত্তর দেই। (জামিউ বয়ানিল ইলমি ওয়া ফাজলিহী হাদীস নং ১৬২১)

৭। হযরত ইবরাহীম নাখয়ী (রহ.) বলেন, সব মাসআলা আমাদের জানা থাকে না, অর্থাৎ সরাসরি সুন্নাহে উল্লেখ থাকে না। বরং আমরা একটা মাসআলা দ্বারা অন্যটি চিহ্নিত করি এবং একটা জানা মাসআলার উপর অজানা মাসআলাকে কিয়াস করি। (জামিউ বয়ানিল ইলামি ওয়া ফাজলিহী হাদীস নং ১৬৪৬)

৮। ইমাম শা'বী (রহ.) বলেন, গরুর যাকাতের ক্ষেত্রে চল্লিশোর্ধ্ব সংখ্যার ক্ষেত্রে আমরা কিয়াস করে আমল করি। (জামিউ বয়ানিল ইলমি ওয়া ফাজলিহী হাদীস নং ১৬৪৫)

হাফেজ ইবনে আব্দুল বার (রহ.) তার কিতাবে তাবেঈদের বিশাল এক জামাআতের নাম উল্লেখ করেছেন যারা মাসাইলের সমাধানে নুসূসে শরয়ীর অবর্তমানে ইজতিহাদ করে জবাব দিয়েছেন। বিভিন্ন শহরে উক্ত খিদমতে নিয়োজিত কয়েকজন বিশিষ্ট তাবেঈর নাম উল্লেখ করা হচ্ছে।

(ক) মদীনা : সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব, সুলাইমান ইবনে ইয়াসার, কাসেম ইবনে মুহাম্মদ, ইবনে শিহাব প্রমূখ।

(খ) মক্কা ও ইয়ামান : মুজাহিদ, ত্বাউস, ইবনে জুরাইজ প্রমূখ।

(গ) কুফা : আলকামা, আসওয়াদ, ইবরাহীম নাখয়ী, শুরাইহ, হাম্মাদ ও ইমাম আবু হানীফা প্রমূখ।

(ঘ) বসরা : হাসান বসরী ইবনে সিরীন প্রমূখ।

(ঙ) শাম : মাকহুল, আউযায়ী, সুলাইমান ইবনে মুসা প্রমূখ।

(চ) মিসর : ইয়াযীদ ইবনে আবু হাবীব, আমর ইবনে হারেস, লাইস ইবনে সাদ প্রমূখ।

কিয়াস ও ইজতিহাদকে শরীয়তের দলীল মনে করে তার ভিত্তিতে ফায়সালা দেওয়া ও আমল করা সংক্রান্ত বহু সংখ্যক আসর তাবেঈদের থেকে বর্ণিত আছে। তার যৎসামান্যই উপরে উল্লেখ করা হল। ইলমে দ্বীনের সঙ্গে যাদের ন্যূনতম সম্পর্ক আছে এবং যারা দ্বীনের রুচি সম্পর্কে জ্ঞাত তাদের জন্য এটুকুই যথেষ্ট।

তাকলীদ সম্পর্কে তাবেঈ ও তবে তাবেঈদের উক্তি ও আমল :

মুসলমান মাত্রই একথা বিশ্বাস করেন যে, দ্বীনের মুল বিষয় হল কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলাকে মেনে চলা ও তাঁর অনুসরণ করা। এমনকি নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অনুসরণও শুধু এ কারণে ওয়াজিব যে, তিনি ছিলেন আল্লাহ তা'আলার মুখপত্র ও ব্যাখ্যাকার। কোন জিনিস হালাল, কোনটি হারাম, কোন কাজ বৈধ, কোনটি অবৈধ এ ব্যাপারে শুধুমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূলেরই আনুগত্য করতে হবে। কেউ যদি আল্লাহ ও রাসূলকে বাদ দিয়ে অন্য কারও আনুগত্যের কথা বলে সে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাবে। কাজেই মুসলমানদেরকে কেবল কুরআন ও সুন্নাহর বিধিবিধানই মেনে চলতে হবে, অন্য কারও বিধান নয়।

দুটি বিষয় আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। প্রথম কথা হলো, কুরআন ও সুন্নাহর কিছু বিধান এমন আছে যেগুলোর মর্ম কুরআন হাদীস ও আরবী ভাষা সম্পর্কে সাধারণ বুঝমান ব্যক্তিও অনুধাবন করতে পারে। কারণ এগুলো দ্ব্যর্থহীন এবং সংক্ষেপন ও সুক্ষ্মতামুক্ত। ফলে এর পাঠ নিঃসংশয়ে তার অর্থ বুঝতে পারবে। যেমন কুরআনের বাণী لايغتب بعضكم بعضا আরবী ভাষী মাত্রই জানেন যে, এর অর্থ হল তোমরা একে অপরের আগোচরে নিন্দা করবে না।

পক্ষান্তরে কুরআন হাদীসে এমন অনেক বক্তব্য রয়েছে যেগুলো দ্ব্যর্থবোধক, সুক্ষ্ম ও সংক্ষিপ্ত। আবার কিছু বক্তব্য বাহ্যিক দৃষ্টিতে পরস্পরে সাংঘর্ষিক।

দ্ব্যর্থবোধক বাণীর উদাহরণ

والمطلقٰت يتربصن بانفسهن ثلثة قروء

"তালাক প্রাপ্তা মহিলাগণ তিন কুরু পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে।

আয়াতে বর্ণিত قروء শব্দের দুটি অর্থ ১. হায়েয ২. পবিত্রতা। উক্ত আয়াতে এই দুই অর্থের কোনটি উদ্দেশ্য তা অস্পষ্ট। বলাবাহুল্য হায়েয ও পবিত্রতা এবং বিপরীতমুখী দু'টি বিষয়ে এক সঙ্গে আমল করা সম্ভব নয়। অথচ কোনো একটার ওপর আমল করতেই হবে। কাজেই দুই অর্থের কোনো একটি নির্ধারনের ক্ষেত্রে একজন বিশেষজ্ঞ ইমামের শরনাপন্ন হয়ে তার তাকলীদ বা অনুসরনের বিকল্প নেই।

অনুরূপ এক হাদীসে এসেছে –

لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

"ফাতিহা ছাড়া নামায পূর্ণ হয় না।

আর অন্য এক হাদীসে এসেছে–

من كان له امام فقراءة الامام قراءة له

"যার ইমাম আছে ইমামের কিরাআত তারই কিরাআত।"

এখানে প্রথম হাদীসটি বাহ্যিকভাবে দ্বিতীয়টির সঙ্গে সাংঘর্ষিক মনে হচ্ছে। সুতরাং আমল করতে হলে কোনো ইমামের তাকলীদ করে উভয় হাদীসের সঠিক অর্থ অনুধাবন করতে হবে।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

লেখক : শায়খুল হাদীস ও প্রধান মুফতী
জামিয়া রহমানিয়া, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

শেয়ার বাজার

শরীয়তের দৃষ্টিতে একটি পর্যালোচনা-২

মাওলানা মুফতী এনামুল হক কাসেমী

ফেইস ভ্যালুর চেয়ে মার্কেট ভ্যালু বেশি হওয়ার কারণ:

সাধারণত দেখা যায়, শেয়ারের ফেইস ভ্যালুর চেয়ে মার্কেট ভ্যালু কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায়। যেমন শেয়ারের ভ্যালু যদি থাকে ১০টাকা তাহলে তার মার্কেট ভ্যালু ৭০/৮০/৯০/১০০/১৫০/১৮০/২০০ পর্যন্ত হয়। আবার ১০০ টাকার ফেইসভ্যালুর শেয়ার ২৮০০, ৩০০০ পর্যন্ত বিক্রি হয়। প্রশ্ন জাগে ফেইস ভ্যালূর চেয়ে মার্কেট ভ্যালু এমনভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ কি?

শেয়ার ব্যবসা করে এমন কয়েকজন অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা হলে তারা বিভিন্ন কারণ বর্ণনা করে। অনেক সময় কোম্পানি নিজেই শেয়ারের ফেইস ভ্যালুর চেয়ে আরো কিছু অর্থ প্রিমিয়াম হিসেবে গ্রহণ করে। যেমন- গ্রামীন ফোন শেয়ারের ফেইস ভ্যালু ১০ টাকা, কিন্তু সে প্রিমিয়াম হিসেবে অতিরিক্ত আরো ৬০ টাকা নেয়। ফলে শেয়ারের প্রাথমিক বাজারেই মূল্য দাঁড়ায় ৭০ টাকা। কোম্পানির সম্পদ, সুনাম বাড়ার কারণেও শেয়ারের দাম বাড়ে। শেয়ারের প্রতি অধিক চাহিদার কারণেও দাম বাড়ে। অনেক সময় দেখা যায় প্রাইমারি মার্কেটে যে পরিমাণ শেয়ার ছাড়া হয়েছে তার চেয়ে ৮০/৯০ গুন বেশি আবেদন জমা হয়েছে শেয়ার কেনার জন্য । যারা প্রাইমারি মার্কেটে শেয়ার পায়নি তারা সেকেন্ডারি মার্কেটে ওই শেয়ার কেনার জন্য আগ্রহী হয়। ফলে শেয়ারের চাহিদা বৃদ্ধির কারণে মূল্য বৃদ্ধি পায়।

এছাড়া বিভিন্ন সময় কিছু কিছু অসাধু বিনিয়োগকারী সিন্ডিকেট করে শেয়ার ধরে রেখে কৃত্রিম চাহিদা সৃষ্টি করে মূল্য বাড়িয়ে থাকে। এসকল ব্যক্তিদেরকে বলা হয় গেইমার। যেমন চারজন গেইমার বাজারে চারশত কোটি টাকা নিয়ে এলো। ক,খ,গ,ঘ এই চারটি কোম্পানির বাজারে ৬০০ কোটি টাকার শেয়ার আছে। এসকল গেইমার পরস্পরের মাঝে সমঝোতা করে কোম্পানি চারটির চারশত কোটি টাকার শেয়ার কিনে ধরে রাখল। হঠাৎ করে কোম্পানিগুলোর চারশত কোটি টাকার শেয়ার না থাকায় বাকি শেয়ার গুলোর প্রতি তীব্র চাহিদা সৃষ্টি হয়, এমনকি অনেক বিনিয়োগকারীর কাছে মূল্য কোনো সমস্যা নয়, মূল্য যতই হোক তাদের কাম্য হয়ে থাকে শুধু শেয়ার পাওয়া। যখন গেইমাররা বাজারে উক্ত কোম্পানিগুলোর তীব্র চাহিদা লক্ষ্য করে তখন তারা শেয়ারগুলো চড়া মূল্যে বিক্রি করে বাজার থেকে উধাও হয়ে যায়। তারপরই শেয়ারের মূল্যে ধ্বস নামে।

শেয়ার বাজারের শরয়ী বিধান :

যৌথমূলধনের কোম্পানি বা শেয়ার ইস্যুকারী কোম্পানিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

এক. এমন কোম্পানি যাদের মূল কার্যক্রম বৈধ। তাদের উদ্দেশ্যও ভালো। যেমন মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস উৎপাদন করা এবং বিভিন্ন প্রকারের সেবা প্রদান করা ইত্যাদি। যথা টেক্সটাইল কোম্পানি, মোবাইল ফোন কোম্পানি প্রভৃতি। এসকল কোম্পানি কোনো প্রকারের শরিয়া নিষিদ্ধ কার্যক্রমের সাথে জড়িত হয় না। সুদের উপর ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে না এবং সুদের উপর উদ্বৃত্ত অর্থ ব্যাংকে রাখেও না। অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে এসকল কোম্পানির শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় জায়েয আছে। কিছু ওলামায়ে কেরাম না জায়েয বললেও সেই অভিমতটি অত্যন্ত দূর্বল এবং বর্তমানে পরিত্যাজ্য।

দুই. যে সকল কোম্পানির মূল কার্যক্রমই শরিয়তের আলোকে নিষিদ্ধ এবং তাদের উদ্দেশ্যও অসৎ; যেমন- শুকর প্রতিপালনকরী কোম্পানি, মদ উৎপাদনকারী কোম্পানি, সুদি ব্যাংক, সুদি বীমা, জুয়া কোম্পানি এবং ফিল্ম ইত্যাদি। এসকল কোম্পানির শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হারাম হওয়ার ব্যাপারে কারো কোনো দ্বিমত নেই। হক্কানী সকল ওলামায়ে কেরামের মতে এসকল কোম্পানির শেয়ার লেনদেন করা হারাম এবং নিষিদ্ধ। মদ্যপান যেমন হারাম, মদের বেচাকেনা যেমন হারাম তেমনিভাবে মদের কোম্পানির শেয়ার কেনা ও বেচাও হারাম। অনুরূপ সুদি কোম্পানি, শুকরের কোম্পানি, জুয়া কোম্পানি এবং ফিল্ম ইত্যাদি।

তিন. যেসকল কোম্পানির মূল কার্যক্রম বৈধ এবং উদ্দেশ্যও সৎ কিন্তু কখনও কখনও তারা শরিয়া নিষিদ্ধ কার্যক্রমে জড়িয়ে পড়ে; যেমন প্রয়োজনে সুদি ব্যাংক থেকে সুদের উপর ঋণ গ্রহণ করে এবং উদ্বৃত অর্থ সুদি ব্যাংকে সুদের ভিত্তিতে জমা রাখে। এরূপ কোম্পানির শেয়ার নিয়েই মূলত বিস্তর মতপার্থক্য ও মতভেদ রয়েছে। কেউ এ ধরনের কোম্পানির শেয়ার বেচাকেনাকে নাজায়েয বলেন, আবার অনেক ওলামায়ে কেরাম শর্তসাপেক্ষে জায়েয বলেন। এধরনের কোম্পানির শেয়ারকে বলা হয় মিশ্র শেয়ার। অর্থাৎ হালাল উপার্জন কিছু হারাম উপার্জনের সাথে মিশে গেছে। (আল আসহুমুল মুখতালেতা পৃষ্ঠা ৪৬, ৪৭, তেজারতি কোম্পানি কে লায়েহায়ে আ'মল, আল ইকতিতাব ওয়াল মুতাজারাতু বিল

আসহুম পৃষ্ঠা ৯, ১৩, ১৪)

এই তৃতীয় প্রকার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে প্রথমে আলোচনা করা হবে।

১. শেয়ার বাজারে ক্রয়-বিক্রয়।

২. শেয়ারের কব্জা কখন হয়?

৩. প্রাইমারি মার্কেটে লটারির মাধ্যমে শেয়ার বরাদ্দ দেওয়ার শরয়ী বিধান।

৪. ব্রোকারের মাধ্যমে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়।

৫. বোনাস শেয়ারের বিধান।

৬. শেয়ার ক্রয়ের পর দুই কার্যদিবসের পূর্বে বিক্রি করার উপর নিষেধাজ্ঞা।

শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় :

শেয়ার বাজারের মূল লক্ষ্য হলো কোম্পানির পুঁজি সংগ্রহ করা, এই লক্ষ্যের আলোকে শেয়ার বাজার নাজায়েয হওয়ার কোনো কারণ নেই। কিন্তু বর্তমানে যেহেতু অধিকাংশ কোম্পানি প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে সুদি কায়কারবারে জড়িত এবং কোম্পানির নিট এসেট ভ্যালুর চেয়ে মার্কেট ভ্যালু অনেক বেশি, তাই অনেক ওলামায়ে কেরাম বর্তমান শেয়ার বাজারকে নাজায়েয বলেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হলো। শায়খ সিদ্দিক আহমদ আদ্দরির, শায়খ আব্দুল আজিজ ইবনে বায, ড. আহমদ মুহাম্মদ আলি, ড. মুস্তফা যারক্বা, ড. সালেহ ইবনে ফাওয়যান, হাবিব খাওজ, ড. বকর আবু যায়েদ, শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ সুবাইলি, শায়খ মুহাম্মদ ইবনে জুবাইরা, ড. ইউসুফ আল ক্বারাজাবি প্রমূখ। এছাড়া অনেক ইসলামী ব্যাংকের শরিয়া বোর্ডও বর্তমান শেয়ার বাজারকে নাজায়েয বলেছেন। এসবের মধ্যে আছে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি), বায়তুত তামভীল কুয়েত, দুবাই ইসলামী ব্যাংক, সুদান ইসলামী ব্যাংক। (আল ইকতেতাব ওয়াল মুতাজারাতু বিল আসহুম পৃ: ১৪, আল আসহুমুল মুখতালিত্বা পৃ: ৪৯)

অনেক উলামায়েকেরাম বর্তমান শেয়ারবাজারে ক্রয়-বিক্রয়কে শর্তসাপেক্ষে অনুমতি দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হলো। আল্লামা মুফতী তক্বি উসমানী, ড. ওয়াহবাতুযযুহায়লি, ড. আলি মুহি উদ্দীন কোরাদাগী, এরশাদ বাকুবি, মাওলানা আবুবকর কাসেমী, আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভী, শায়খ মুহাম্মদ উসাইমান (রহ.) খাল্লাফ, শায়খ আব্দুল আজিজ আল খাইয়াত, ড. আব্দুল আজিজ ইসলাহী প্রমূখ। (আল ইকতেতাব ওয়াল মুতাজারাতু বিল আসহুম পৃ: ১৪, আল আসহুমুল মুখতালিত্বা পৃ: ৪৯)

শেয়ার বাজার বৈধ হওয়ার মত পোষণকারীদের অভিমত :

কোম্পানির বাহ্যিক ধ্যান-ধারণা এবং তার বিষয় বস্তুর উপর লিখিত গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করলে বুঝা যায়, শেয়ার হোল্ডাররা কোম্পানির আসবাব পত্রের মালিক হয়। তাই পারস্পরিক মীমাংসার ভিত্তিতে কোনো কোম্পানি বিলুপ্ত হলে শেয়ার হোল্ডাররা শুধু তাদের প্রদত্ত অর্থই ফেরত পায় না বরং কোম্পানির আসবাবপত্রের অনুরূপ অংশও ফেরত পায়। তাই বুঝা গেল শেয়ার শুধু ঋণের প্রমাণ নয়। বরং শেয়ার এমন একটি সার্টিফিকেট যা শেয়ার হোল্ডারদের মালিকানার প্রতিনিধিত্ব করে। সুতরাং শেয়ার কোনো মুখ্য উদ্দেশ্য নয় বরং এর পশ্চাতে যে সম্পদ বা আসবাব রয়েছে তাই আসল। তাই শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় মূলত কোম্পানির আসবাবপত্র থেকে অনুরূপ মালিকানা ক্রয়-বিক্রয়। কোম্পানির আসবাব পত্র বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। যেমন-নগদ অর্থ, পরিশোধযোগ্য ঋণ, স্থায়ী সম্পদ, ব্যবসার পণ্য প্রভৃতি। প্রত্যেক প্রকারেই শেয়ার হোল্ডারের অনুরূপ অংশ থাকে। অতএব শেয়ার বিক্রয়ের অর্থ নগদ ঋণ, স্থায়ী সম্পদ এবং ব্যবসার পণ্য এগুলোর মধ্যে নিজের অনুরূপ মালিকানা বিক্রয় করা। এর আলোকে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়, তার শর্তসমূহের ব্যাখ্যা নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের শর্তসমূহ :

১. কোম্পানির মূল কারবার বৈধ এবং হালাল হতে হবে। যেমন ঔষধ, জুতা, পোশাক শিল্প প্রভৃতি কোম্পানি। যেসকল কোম্পানির মূল কারবার বৈধ নয় তাদের শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে না। যেমন- মদ, শুকরের গোশত, সুদি ব্যাংক, প্রচলিত বীমা ইত্যাদি কোম্পানির শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় বৈধ নয়। (আল ইকতিতাব ওয়াল মুতাজারাতু বিল আসহুম পৃ: ১৬)

২. শেয়ার হোল্ডার যেহেতু কোম্পানির অংশীদার এবং তাদের থেকে নির্বাচিত ব্যক্তি কোম্পানি পরিচালনা করে (বোর্ড অব ডাইরেক্টর) তাই শেয়ার হোল্ডার কোম্পানির লাভ-ক্ষতির মধ্যেও অংশীদার হবে। অর্থাৎ কোম্পানির লাভ হলে শেয়ার হোল্ডার লভ্যাংশ পাবে। আর ক্ষতি হলে ক্ষতির ঝুঁকিও বহন করতে হবে। (ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া ২/৩৩৬)

৩. বাস্তবে যে মুনাফা হবে তা শতাংশের আনুপাতিক হারে নির্ধারণ করতে হবে। মাসিক, বাৎসরিক কোনো নির্দিষ্ট অংকের মুনাফা নির্ধারণ করতে পারবে না। যেমন- অমুক শরিককে মাসে একশত টাকা করে প্রদান করা হবে। বরং শতাংশের আনুপাতিক হারে যে মুনাফা নির্ধারিত হয়েছে তাই কোম্পানি এবং শেয়ার হোল্ডারদের মাঝে বণ্টন হবে। যেমন বাদায়ে উসসানায়ে কিতাবে বর্ণিত আছে–

ان يكون الربح معلوم القدر وان يكون الربح جزءا شائعا فى الجملة لا معينا، فان عين عشرة، او مائة او نحو ذلك كانت الشركة فاسدة۔

"লভ্যাংশের পরিমাণ শিরকাতের মধ্যে জানা থাকতে হবে এবং মুনাফার মধ্যে উভয়ের জন্য অবিভাজ্য অংশ থাকতে হবে। কারো জন্য কোনো অংক নির্ধারণ

করা যাবে না। যদি করে, যেমন দশ, একশত বা এমনিভাবে অন্য কিছু তাহলে শিরকত বাতিল হয়ে যাবে। (বাদায়ে উসসানায়ে ১৩/৭৮, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ৫/৫৮০, ফিকহুল মু'আমালাত ১/৪১৪, ফতাওয়ায়ে হিন্দিয়া ২/৩২১)

কোম্পানির আসবাবপত্র নগদ অর্থ ও ঋণের আকৃতিতে না থাকলে শেয়ারকে অভিহিত মূল্যের চেয়ে কমবেশি মূল্যে বিক্রি করা যাবে। কিন্তু কোম্পানি যদি এখনো কোনো প্রকার স্থায়ী সম্পদ যেমন বিল্ডিং, মেশিনারি ইত্যাদি অথবা ব্যবসায় পণ্য ক্রয় না করে বরং তাদের কাছে শুধু নগদ অর্থ থাকে তাহলে শেয়ারকে অভিহিত মূল্যে (Face Value) বিক্রি করতে হবে। কমবেশি করা যাবে না। কেননা তখন শেয়ার শুধু নগদ টাকারই প্রতিনিধিত্ব করে। অর্থাৎ অভিহিত মূল্য দশ টাকা হলে দশ টাকা, একশত টাকা হলে একশত টাকার প্রতিনিধিত্ব করে। কোনো সম্পদের নয়। এই শেয়ার যখন টাকা দিয়ে কিনবে তখন টাকাকে টাকার সাথে লেনদেন করা হবে। আর টাকাকে টাকার সাথে লেনদেন করতে হলে উভয় পক্ষ থেকে সমান সমান হতে হবে। কমবেশি করা জায়েয নাই। তাই দশ টাকার শেয়ার এই অবস্থায় এগার টাকা কিংবা নয় টাকায় বিক্রি করা জায়েয হবে না। তবে বর্তমানে কোনো কোম্পানি শেয়ার ছাড়তে হলে তাকে কমপক্ষে তিন বছর ব্যবসা করার সফল রেকর্ড থাকতে হবে। তাই শেয়ার ছাড়ার সময় কোম্পানির সকল সম্পদ নগদ অর্থে কিংবা ঋণের আকৃতিতে থাকে না। বরং নগদ টাকার সাথে কোম্পানির অন্যান্য আসবাবপত্রও থাকে। এক্ষেত্রে শেয়ার বিক্রি করার অর্থ হবে কোম্পানির পুরো সম্পদ অর্থাৎ নগদ টাকা, বিল্ডিং, মেশিনারিজ ইত্যাদির মধ্যে প্রত্যেকের আনুপাতিক অংশের বিক্রয়।

এখন আলোচনার বিষয় হলো নগদ টাকার সাথে অন্যান্য আসবাবপত্র নগদ টাকার বিনিময়ে বিক্রি করা জায়েয হবে কি না?

এই মাসআলাটির ভিত্তি অন্য আরেকটি মাসআলার উপর যা ফুক্বাহায়ে কেরামের নিকট 'মুদ্দে আজওয়া'র মাসআলা নামে পরিচিত। অর্থাৎ সুদ বিশিষ্ট পণ্য (যে সকল পণ্যের লেনদেনে সুদের উৎপত্তি ঘটে) এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি একত্রিত করে যদি কেবল সুদ বিশিষ্ট পণ্যের বিনিময়ে বিক্রি করে তার হুকুম কি?

যেমন স্বর্ণযুক্ত তলোয়ার বিক্রি করলো দিনারের বিনিময়ে। এখানে স্বর্ণ হলো সুদ বিশিষ্ট পণ্য আর তলোওয়ার হলো সাধারণ পণ্য তাকে সুদ বিশিষ্ট পণ্য স্বর্ণের সাথে একত্রিত করে বিক্রি করলো আরেক সুদ বিশিষ্ট পণ্য দিনারের বিনিময়ে। এই মাসআলায় ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এবং ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর মতবিরোধ আছে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, সুদ বিশিষ্ট সম্পদ অর্থাৎ স্বর্ণকে পৃথক না করে বিক্রি করা জায়েয হবে না। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে জায়েয হবে। শর্ত হলো যে সুদবিশিষ্ট মালের বিনিময়ে বিক্রি করবে সে মাল মিশ্র সুদ বিশিষ্ট মালের চেয়ে বেশি হতে হবে। অর্থাৎ দিনারের মধ্যে স্বর্ণের পরিমাণ তলোয়ারের স্বর্ণের চেয়ে বেশি হতে হবে। যাতে তলোয়ারের স্বর্ণ দিনারের স্বর্ণের বিনিময়ে হয়। আর দিনারের বাড়তি স্বর্ণ তলোয়ারের বিনিময়ে হয়।

وعن الشعبى رضى الله عنه قال لابأس ببيع السيف المحلى بالدراهم ومراده اذا كان وزن الحلية اقل من وزن الدراهم ليكون الفضل بازاء الجفن والحمائل۔

"ইমাম শা'বী (রহ.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, অলঙ্কার সজ্জিত তলোয়ার (রৌপ্য সজ্জিত তলোয়ারকে) দেরহামের বিনিময়ে বিক্রি করার মধ্যে কোনো অসুবিধা নাই যদি অলঙ্কারের ওজন দেরহামের চেয়ে কম হয়। যাতে বাড়তি দেরহাম বেল্ট এবং হাতলের বিনিময়ে হয়। (মাবসুত ১৬/২৮৭, ফাতহুল কদীর ১৬/৮৩, মুহিতুল বুরহানী ৭/৪০৩)

باع مد عجوة ودرهما بمد عجوة او بدرهمين لا يجوز لهذا الحديث هذا منقول عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وابنه وجماعة السلف

وهو مذهب الشافعي واحمد واسحاق ومحمد بن عبد الحكيم المالكى وقال ابو حنيفة والثورى، والحسن بن صالح يجوز بيعه باكثر مما فيه من الذهب ولا يجوز بمثله ولا بدونه۔ وقال مالك واصحابه واخرون يجوز بيع السيف المحلى بذهب۔

"কোনো ব্যক্তি একমুদ খেজুর ও দেরহাম বিক্রি করলো একমুদ খেজুরের বিনিময়ে অথবা দুই দেরহামের বিনিময়ে বিক্রি করলো এধরনের বেচাকেনা জায়েয নাই এই হাদীসের নিষেধাজ্ঞার কারণে। এটাই ইমাম শাফেয়ী (রহ.), আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) ইসহাক (রহ.) এবং মুহাম্মদ ইবনে হাকিম মালেকী (রহ.) এর মাযহাব। ইমাম আবু হানীফা (রহ.), ছওরী (রহ.) এবং হাসান ইবনে সালেহ (রহ.) বলেন, এধরনের বেচাকেনা জায়েয আছে। তলোয়ারের মধ্যে যে পরিমাণ স্বর্ণ আছে তার চেয়ে বেশি পরিমাণ স্বর্ণের বিনিময়ে। সমপরিমাণ স্বর্ণ কিংবা তারচেয়ে কম স্বর্ণ হলে জায়েয হবে না। ইমাম মালেক (রহ.) এবং অন্যান্য শিষ্যরাও বলেন স্বর্ণ খচিত তলোয়ারের বেচাকেনা জায়েয। (তুহফাতুল আহওয়াজি ৫/৩৮৯, শরহে নববী আল মুসলিম ১১/১৮)

শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় ও মুদ্দে আজওয়ার মাসআলার মত। নগদ অর্থ এবং নগদবিহীন আসবাব নগদের বিনিময়ে বিক্রি হচ্ছে। উল্লেখিত মাসআলার আলোকে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে না। শাফেয়ীদের অনেকে ও হাম্বলীদের মতে যদি কোম্পানির আসবাবপত্র বেশি হয় এবং নগদ অর্থ কম হয় শেয়ার ক্রয়

বিক্রয় জায়েয হবে। পক্ষান্তরে নগদ অর্থ বেশি আর আসবাবপত্র কম হলে শেয়ার বিক্রি নাজায়েয হবে।

বর্তমান আরববিশ্বের অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম এমনই ফতওয়া দিয়েছেন, যে দৃষ্টিকোণ থেকে শেয়ার ক্রয়ের পূর্বে কোম্পানির আসবাবপত্র পর্যবেক্ষন করা জরুরি যে, নগদ অর্থ বেশি না নগদ ছাড়া কোম্পানির অন্য সম্পদ বেশি। কিন্তু হানাফীদের মতে এমন কোনো ব্যাখ্যা কিংবা পর্যবেক্ষন করার দরকার নেই। নগদ অর্থ ছাড়াও কোম্পানির কিছু আসবাব পত্র আছে তা জানতে পারলে অভিহিত মূল্যের চেয়ে কমবেশি মূল্যের শেয়ার বিক্রি করা জায়েয হবে। তবে যদি শেয়ারের পূর্ণ মূল্য কোম্পানির নগদ অর্থ এবং ঋণের সমপরিমাণ কিংবা কম হয় তাহলে এ শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে না। যেমন দশ টাকা মূল্যমানের শেয়ারের মধ্যে নগদ অর্থ এবং ঋণ আছে আটটাকার আর দুই টাকা আছে স্থায়ী সম্পদ আকারে। এই শেয়ার আট টাকায় কিংবা তার চেয়ে কম মূল্যে বিক্রি করা জায়েয হবে না। তবে নয় টাকা বা তার চেয়ে বেশি মূল্যে বিক্রি করা জায়েয হবে।

উল্লেখিত আলোচনার সারসংক্ষেপ :

ক. যে সকল কোম্পানির নগদ অর্থ আছে, এখনও কোনো স্থায়ী সম্পদ অর্জন করেনি এ ধরনের কোম্পানির শেয়ার অভিহিত মূল্যেই বিক্রি করতে হবে। তার চেয়ে কমবেশি করা জায়েয হবে না।

খ. যেসকল কোম্পানির নগদ অর্থের সাথে স্থায়ী সম্পদ আছে তাদের শেয়ার অভিহিত মূল্যের চেয়ে কম বেশি মূল্যে বেচাকেনা করতে পারবে।

গ. শেয়ারের পিছনে যে নগদ অর্থ আছে তার পরিমাণ শেয়ারের মার্কেট ভ্যালু থেকে কম হতে হবে।

৫. পঞ্চম নাম্বার শর্ত হলো কখনও কোম্পানির মূল কারবার হালাল কিন্তু অন্য কোনোভাবে কোম্পানি সুদি লেনদেনে জড়িত হয়। যেমন- ব্যাংক থেকে সুদের উপর ঋণ গ্রহণ করে, অনেক কোম্পানি ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্যও হয়। কারণ ঋণ গ্রহণ না করলে তার উপর মাত্রাতিরিক্ত আয়কর চাপিয়ে দেওয়া হয়। এমন কোম্পানির শেয়ার বিধান কি? যত বিপত্তি আর সমস্যা এখানেই। এটাকে কেন্দ্র করেই বর্তমান ওলামায়ে কেরামের মধ্যে শেয়ার এর বাজার নিয়ে বিতর্ক।

কিছু ওলামায়ে কেরাম মনে করেন কোম্পানি যেভাবেই সুদি কারবারে জড়িত হোক, চাই তারা মৌলিকভাবে সুদি কারবার করুক, অথবা মূল কার্যক্রম বৈধ কিন্তু বিভিন্ন প্রয়োজনে সুদি ঋণ গ্রহণ, সুদের উপর ব্যাংকে অর্থ রাখুক, সুদ কম হোক বেশি হোক তাদের শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয হবে না।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

লেখা আহ্বান **লেখা আহ্বান** **লেখা আহ্বান**

আল-আবরার পরিবার অত্যন্ত আনন্দের সাথে আহ্বান জানাচ্ছে, সমাজের বিজ্ঞ, দক্ষ, সহনশীল ও মননশীল ইসলামিক স্কলার, গবেষক, কবি, সাহিত্যিক ও লেখকদের মূল্যবান তাত্ত্বিক লেখনী ও কবিতার, যা পূরণ করবে সমাজের ইসলামপ্রিয় সর্বসাধারণের ধর্মীয় চাহিদা ও মেটাবে তাদের পিপাসা।

লেখা পাঠানোর নিয়মাবলি

১। লেখককে অবশ্যই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসারী হতে হবে।
২। লেখকের পূর্ণ ঠিকানা পেশ করতে হবে।
৩। লেখা বিষয়ভিত্তিক, যুগোপযোগী, গবেষণালব্ধ ও তথ্যবহুল হতে হবে।
৪। কোনো সাম্প্রদায়িক, রাজনৈতিক ও বিতর্কিত লেখা গ্রহণযোগ্য হবে না।
৫। প্রতিটি বিষয়ের রেফারেন্স সবিস্তারে উল্লেখ থাকতে হবে।
৬। লেখা এ-৪ সাইজের কাগজে এক পিঠে কম্পোজ করে অথবা সুন্দর হস্তাক্ষরে স্পষ্টভাবে লিখে দিতে হবে।
৭। সম্পাদনা দফতর লেখা নির্বাচন, কাটছাঁট করার সম্পূর্ণ এখতিয়ার রাখবে।
৮। অনির্বাচিত লেখা ফেরত পাঠানো হবে না।
৯। লেখা প্রতি ইংরেজি মাসের ২০ তারিখের মধ্যে সম্পাদনা দফতরে পৌঁছাতে হবে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

প্রকাশনা দফতর : মাসিক আল-আবরার
ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বাংলাদেশ,
ব্লক-ডি, ফক্বীহুল মিল্লাত সরণি, বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, বাড্ডা, ঢাকা।
ই-মেইল : monthlyalabrar@gmail.com

কোয়ান্টাম মেথড-৭

সর্বধর্ম সমন্বয় দর্শন

মুফতী শরীফুল আ'জম

মানব জাতির সামগ্রিক সুখ-শান্তি ও উভয় জাহানের সফলতার জন্য প্রবর্তিত হয়েছে দ্বীন, শরীয়ত বা ধর্ম। বান্দাদের প্রতি যা আল্লাহ পাকের অশেষ কৃপার একটি নমুনা। ধর্মের দিকনির্দেশনা যদি না থাকতো তবে মানুষ উদ্ভ্রান্তের ন্যায় জীবন যাপন করতো। স্রষ্টার সন্তুষ্টির পথ কখনোই নিজের মস্তিষ্ক দিয়ে আবিস্কার করতে পারত না। সর্বপ্রথম মানব হযরত আদম (আ.)কে পৃথিবীতে প্রেরণের সাথে সাথেই আল্লাহ পাক এই শরীয়ত বা ধর্ম বিধান অবতীর্ণ করার ধারা চালু করে দেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে– "তবে যে ব্যক্তি আমার সে হেদায়াত অনুসারে চলবে তার উপর না কোনো ভয় আসবে, না তারা চিন্তাগ্রস্ত সন্তপ্ত হবে।" (সূরা আল বাকারা ৩৮) তাই সকল প্রকার দুঃখ-কষ্ট শংকা আর দুশ্চিন্তাকে পাশ কাটিয়ে সুখ-স্বাচ্ছন্দময় জীবন পেতে হলে ওই সকল ধর্ম বিধান পালন আবশ্যকীয়। এর বিপরীত ধর্ম বা শরীয়তকে অবজ্ঞা করে পৃষ্ঠ প্রদর্শনের ভয়াবহ পরিণতির কথাও এর পরের আয়াতে বলে দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে– "আর যে লোক তা অস্বীকার করবে এবং আমার নিদর্শনগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পাবে তারাই হবে জাহান্নামবাসী। অনন্তকাল সেখানে থাকবে।" (সূরা আল-বাকারা ৩৯)

ধর্মের এই বিধান যারা মেনে চলেছে, প্রত্যেক নবী রাসূলের যুগে তারাই মুমিন মুসলমান হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। আর যারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তারা কাফের মুশরিক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর অবতীর্ণ সর্বশেষ ধর্মবিধান বা শরীয়তকে যারা কিয়ামত অবদি মেনে চলবে তারা আল্লাহ পাকের দফতরে মুমিন মুসলমান হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়ে পুরষ্কৃত হবে। আর যারা তাঁর আনীত ধর্মকে অসত্য ও অচল বা অসম্পূর্ণ মনে করে ভিন্ন কোনো ধর্ম অবলম্বন করবে বা নতুন মেথড আবিষ্কারের পেছনে পড়বে তারা ধর্মদ্রোহীদের কাতারে শামিল হয়ে তিরষ্কৃত হবে।

ধোঁকা-প্রতারণা :

দুনিয়ার কোনো রাষ্ট্রে একই সাথে একাধিক সংবিধান বহাল থাকতে পারে না। এক রাষ্ট্রে একাধিক সংবিধান থাকা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। এই সাধারণ কথাটা বুঝতে খুব বেশি প্রজ্ঞার দরকার হয় না। সামান্য বিবেক দিয়েই তা অনুধাবন করা যায়। দুনিয়ার ক্ষুদ্র ক্ষমতার গণ্ডিতে যদি এই নীতি হয় তবে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলার রাজত্বে এক সাথে একাধিক ধর্মবিধান বলবৎ থাকারতো প্রশ্নই ওঠে না। তাই সকল ধর্মগ্রন্থকে বহাল রেখে সকল ধর্মের একসাথে প্রচারণা বা পালনের কোয়ান্টাম মেথড গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। মূলত কোয়ান্টাম মেথড অজ্ঞতাপ্রসূত এরূপ কর্মকাণ্ডকেই "দি সায়েন্স অব লিভিং" নামে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। এধরনের কর্মকাণ্ডের ফলে মুসলমানগণ হবে পথভ্রষ্ট আর অমুসলিমরা হবে প্রতারিত। পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে: "তিনিই তাঁর রাসূলকে পথ নির্দেশ ও সত্যধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেছেন। যাতে একে সব ধর্মের উপর প্রবল করে দেন যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।" (সূরা আসসফ ৯)

ঈমান কুফরের মিশ্রন :

কোয়ান্টামের উদ্ভাবিত জীবন দৃষ্টির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, "কোয়ান্টাম হচ্ছে সেই সায়েন্স অব লিভিং যা বলে দেয় জীবনটাকে কিভাবে সুন্দর করা যায়, ভুল থেকে কিভাবে দূরে থাকা যায়, পাপ কত কম করা যায় আর ভাল বা কল্যাণ কত বেশি করা যায়। কোয়ান্টামের শিক্ষা এ ক্ষেত্রে নবী-রাসূলদের যে শিক্ষা, ওলী-বুযুর্গদের যে শিক্ষা, মুনি-ঋষিদের যে শিক্ষা তা থেকে আলাদা কিছু নয়। হাজার বছর ধরে তারা যে শিক্ষা দিয়ে এসেছেন, কোয়ান্টাম সে কথাগুলোই বলছে। শুধু ভাষাটা আধুনিক।" (হাজারো প্রশ্নের জবাব-মহাজাতক ১/৩০১)

এখানে স্পষ্ট ভাষায় বলা হলো যে, কোয়ান্টামের শিক্ষা হচেছ, নবী রাসূলদের তৌহীদী বাণী ও মুনি-ঋষিদের কুফরী মতবাদের সমন্বিত একটি রূপ।

মেডিটেশনের (বৈজ্ঞানিক ধ্যান) উপকারিতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে- "ইতিহাসের দিকে তাকান, হযরত ইবরাহীম (আ.) আত্মনিমগ্ন হলেন... হযরত মূসা (আ.) সিনাই পাহাড়ে চলে গেলেন, আত্মনিমগ্ন হলেন... যীশুখ্রীষ্ট বা হযরত ঈসা (আ.) মাঝে মাঝে পাহাড়ে চলে যেতেন, আত্ম নিমগ্ন হতেন এবং স্রষ্টার বাণী এনে মানুষের মাঝে, অনুসারীদের মাঝে প্রচার করতেন। আমাদের মুনি-ঋষিরা তপোবনে চলে যেতেন, হিমালয়ে চলে যেতেন সাধনা করতেন, মাহমতি বুদ্ধ অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে বছরের পর বছর ধ্যানমগ্ন থাকলেন। তারপর বোধি লাভ করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) হেরা গুহায়

বছরের পর বছর ধ্যানমগ্ন থাকলেন। তার পর তিনি নবুওয়াত লাভ করলেন।" (হাজারো প্রশ্নের জবাব ১/৮০)

এখানেও সেই একই ধারায় নবী-রাসূল, মুনি-ঋষি ও বুদ্ধের মতানুসারীদের একসূত্রে গেঁথে নতুন এক জীবন দৃষ্টির পথ মসৃন করার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। সকলকে খুশি রাখাই যেন কোয়ান্টামের মূল দর্শন। অথচ পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট ভাষায় বলে দেওয়া হয়েছে– "তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে দিও না এবং জানা সত্ত্বেও সত্যকে তোমরা গোপন করোনা।" (সূরা আল বাকারা ১১২) সত্যমিথ্যার পরিচয় দিতে গিয়ে অন্যত্র বলা হয়েছে– "এটা একারণে যে, আল্লাহই সত্য, আর তাঁর পরিবর্তে তারা যাকে ডাকে সব মিথ্যা এবং আল্লাহই সবার উচ্চে মহান।" (সূরা হজ্ব ৬২) এখানে একটি বিষয়ের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। আর তা হচেছ আমাদের মুনি-ঋষিরা বলতে কাদের মুনি-ঋষি বোঝানো হয়েছে? অন্যান্যদের ক্ষেত্রে তো আমাদের শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি। তাহলে কি ওই লেখক মুনি-ঋষিদের ধর্ম অনুসারী? তাছাড়া মুনি-ঋষি ও বুদ্ধের পরে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নাম উল্লেখ করা নবীজীর শানে চরম বেয়াদবী। এর দ্বারা ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি এদের চরম অবজ্ঞাই প্রতীয়মান হয়।

সর্বধর্ম সমন্বয় প্রচেষ্টার আরো কিছু নমুনা কোয়ান্টামের বই পুস্তক থেকে তুলে ধরা হচ্ছে।

লা-শরীক বহুশরীক :

কোয়ান্টামের উদারতা প্রমাণ করতে গিয়ে কথা প্রসঙ্গে বলা হয়, "আমরা শোকর আলহামদুলিল্লাহ বলি, হরি ওঁম বলি, থ্যাংকস গড বলি, প্রভূ তোমাকে ধন্যবাদ বলি, ভগবান তোমাকে ধন্যবাদ বলি, ইশ্বর তোমাকে ধন্যবাদ বলি। কারণ আমাদের কাছে আল্লাহ যে রকম পবিত্র, ইশ্বর পবিত্র, ভগবান পবিত্র, গডও পবিত্র। কারণ একই প্রভূর অনেক নাম।" (হাজার প্রশ্নের জবাব ১/৫৫)

সাধারণ মানুষ তাদের এই গোছালো কথার মারপ্যাচ বুঝতে না পেরে এমন ভ্রান্ত কুফরী বক্তব্যকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে যাচেছ। অথচ আল্লাহ, ইশ্বর, ভগবান বা গড এর সংজ্ঞা ও পরিচয় কখনও এক হতে পারে না। মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহ তা'আলা হলেন লা-শরীক আর বাকী সবার রয়েছে বহুশরীক। এতে বিন্দু পরিমাণ সন্দেহের অবকাশ নেই।

আলো-আধাঁর কি এক?

একজন খ্রীষ্টান ধর্মীয় দিক দিয়ে কোয়ান্টাম থেকে কি উপকার লাভ করতে পারে? এমন এক প্রশ্নের উত্তরে বলা হচ্ছে, "আসলে একজন খ্রীষ্টান যদি নিয়মিত কোয়ান্টায়ন করেন, মৌন সাধনা করেন তাহলে তিনি একজন ভাল খ্রীষ্টান হবেন, সন্তে রূপান্তরিত হবেন। একজন মুসলমান যদি নিয়মিত কোয়ান্টায়ন করেন তাহলে তিনি একজন ভাল মুসলমান হবেন, বুযুর্গে রূপান্তরিত হবেন। একজন হিন্দু যদি নিয়মিত কোয়ান্টায়ন করেন তাহলে তিনি একজন ভাল হিন্দু হবেন, ঋষিতে রূপান্তরিত হবেন। একজন বৌদ্ধ যদি নিয়মিত কোয়ান্টায়ন করেন, তাহলে তিনি একজন ভাল বৌদ্ধ হবেন, ভিক্ষুতে রূপান্তরিত হবেন।" (হাজার প্রশ্নের জবাব ১/২৩৯)

সর্বধর্ম সমন্বয় দর্শন বাস্তবায়নের এটি একটি জঘণ্যতম কৌশল। কোয়ান্টাম মেনে চললেই হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ও মুসলমান সকলে নিজ ধর্মের খাঁটি অনুসারী হতে পারবেন। কিন্তু সব ধর্মের লোক যদি খাঁটি হিসেবে স্বীকৃতি পায় তাহলে খাঁটির অস্তিত্ব বিলীন হয়ে পৃথিবী ভেজালে নিমজ্জিত হয়ে যাবে। কোয়ান্টামের উচিৎ সাধুবার্তা শুনিয়ে আধুনিক মানুষকে বিভ্রান্ত করার পথ পরিহার করে আসল-নকল, খাঁটি-ভেজাল, ভাল-মন্দ, আলো-আঁধার, অন্ধ-চক্ষুষ্মান, ঈমান-কুফর ও হক-বাতিলের পার্থক্য তুলে ধরা। পবিত্র কুরআনে এই তফাৎ সুস্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে –

"বলুন অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হয়? অথবা কোথাও কি অন্ধকার ও আলো সমান হয়?" (সূরা রা'আদ ১৬)

অপর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে– "দৃষ্টিমান ও দৃষ্টিহীন সমান নয়। সমান নয় অন্ধকার ও আলো। সমান নয় ছায়া ও তপ্ত রোদ। আরো সমান নয় জীবিত ও মৃত।" (সূরা ফাতির ১৯-২২)

এসকল আয়াতে এমন সব বাস্তব উদাহরণ টেনে আনা হয়েছে, যা অস্বীকার করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এখানে ঈমানকে আলো এবং কুফরকে অন্ধকার সাব্যস্ত করা হয়েছে। তাই ঈমান কুফরের এই তফাৎকে মিটিয়ে দিয়ে সকল ধর্মের লোককে নিজ নিজ ধর্মের খাঁটি অনুসারী বানানোর অপকৌশল পবিত্র কুরআনের স্পষ্ট বিরোধিতা ও খোদাদ্রোহিতার শামিল। যেসকল মুসলমান ভায়েরা কোয়ান্টামে যোগ দিয়েছেন, তাদের ভেবে দেখতে হবে যে, আলোর পথ ছেড়ে অন্ধকারের দিকে ধাবিত হচ্ছেন কি না? পবিত্র কুরআনের এই আয়াতটি স্মরণ করুন, যেখানে বলা হচ্ছে– "যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদের অভিভাবক, তাদের তিনি বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। আর যারা কুফরী করে তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত, তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরাই হলো দোযখের অদিবাসী, চিরকাল তারা সেখানেই থাকবে। (সূরা আল-বাকারা ২৫৭) বোঝা গেলো মুমিন আর কাফেরের অভিভাবক এক নয় এবং গন্তব্যও এক নয়। অতএব কোয়ান্টামে

গিয়ে ঈমান কুফরের মোহনায় নিজের ঈমান আমল বিসর্জন দেওয়া থেকে বেঁচে থাকা সকলের কর্তব্য।

একত্ববাদী কারা?

বর্তমান দুনিয়ায় প্রচলিত সকল ধর্মের মূল শিক্ষাই নাকি এক ও অভিন্ন। সকল ধর্মই একত্ববাদ তথা তাওহীদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এমন দাবীকে প্রমাণ করতে গিয়ে বলা হয়েছে, "বেদ, ধম্মপদ, বাইবেল এবং কুরআন ও হাদীসের মর্মবাণীর মূল সুরের ঐক্য আপনাকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করবে। ধর্মাচারে ব্যাপক পার্থক্য থাকলেও আপনি অনুভব করবেন স্রষ্টার একত্বের সাথে মানবজাতির একত্বে।" (কোয়ান্টাম কনিকা- ৮)

উল্লেখ থাকে যে, পবিত্র কুরআনে বর্ণিত তাওরাত ইঞ্জিল আর বর্তমানের বাইবেল এক নয়। যার আলোচনা মাসিক আল-আবরের বিগত সংখ্যায় সবিস্তারে উল্লেখ করা হয়েছে। কোয়ান্টামের বক্তব্য অনুযায়ী হিন্দু ধর্মের বেদ, বৌদ্ধদের ধম্মপদ ও ইহুদী খ্রীষ্টানদের বাইবেল আর ঐশী গ্রন্থ কুরআন হাদীসে স্রষ্টার যে পরিচয় দেওয়া হয়েছে তা এক ও অভিন্ন। সব গ্রন্থেই তাওহীদের কথা বলা হয়েছে। সে হিসেবে মানবজাতিকেও এক জাতি বা এক উম্মত বলা যায়। সকলে একত্ববাদী বা তাওহীদে বিশ্বাসী। হিন্দু বৌদ্ধ, ইহুদী খ্রীষ্টান কেউ কাফের নয়। বরং সকলে একত্ববাদী তথা মুমিন। পার্থক্য শুধু ধর্মাচারের।

সর্বধর্ম সমন্বয়ের এমন সাজানো গোছানো সুক্ষ্ম দর্শন যে, কতবড় মারাত্মক ভ্রান্ত ও ঈমান বিনাশী তা পবিত্র কুরআনে দৃষ্টি দিলে সহজেই বোঝা যায়। ইরাশাদ হচ্ছে–

"নিশ্চয়ই তারা কাফের যারা বলে, আল্লাহ তিনের এক। অথচ এক উপাস্য ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। যদি তারা স্বীয় উক্তি থেকে নিবৃত্ত না হয় তবে তাদের মধ্যে যারা কুফরে অটল থাকবে তাদের উপর যন্ত্রণা দায়ক শাস্তি পতিত হবে।" (সূরা মায়েদা - ৭৩)

উক্ত আয়াতে বর্তমান খ্রীষ্টানদের প্রধান ধর্মবিশ্বাস ত্রিত্ববাদ তথা Trinitarian Doctrine কে কুফরী মতবাদ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। খ্রীষ্টানদের মতে গড হচ্ছেন তিন সত্তার সমষ্টি। অর্থাৎ পিতা পুত্র ও পবিত্র আত্মা। এই তিনে মিলে এক খোদা হচ্ছেন 'গড'। (বাইবেল সে কুরআন তক ১/৪৩)

পবিত্র কুরআনে যে মতবাদকে কুফরী মতবাদ বলে আখ্যায়িত করা হলো, কোয়ান্টাম সে ত্রিত্ববাদকে একত্ববাদ বলে প্রচার করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছে। আবার বড় গলায় বলছে কুরআন হাদীস আর বর্তমান বাইবেলের মূল সুর নাকি একই!

খ্রীষ্টানদের ত্রিত্ববাদ যদি কুফরী হয় তবে হিন্দুদের বহু ইশ্বরবাদের স্থান কোথায় হবে একটু ভেবে দেখুন। হিন্দু ধর্মমতে ব্রহ্মা হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণু পালনকর্তা আর মহাদেব সংহার কর্তা। এই তিনের সমষ্টিকে বলা হয় 'ওঁম'। এর সাথে তেত্রিশ কোটি দেবদেবীতো আছেই। হিন্দুরা এই তেত্রিশ কোটি দেবদেবতা, লতাপাতা পূজা করা সত্বেও যদি কোয়ান্টামের মতে তারা একত্ববাদী বা একেশ্বরবাদী হয় তবে আর কত কোটি দেবতা যোগ করলে তারা বহু ইশ্বরবাদী মুশরিক বলে সাব্যস্ত হবে?

আর বৌদ্ধ ধর্মতো নাস্তিক্যবাদের এক মূর্তপ্রতীক। যেখানে স্রষ্টা বলতে কেউ নেই। এই অনন্ত সৃষ্টি প্রবাহ প্রাকৃতিকভাবে আপনাআপনিই প্রবাহিত হয়ে চলছে। একে পরিচালনা করার জন্য কোনো স্রষ্টার প্রয়োজন হয় না। (ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ- ৬৬০)

সুতরাং ত্রিত্ববাদ, বহু ইশ্বরবাদ ও নাস্তিক্যবাদ এবং ইসলামের একত্ববাদের মত চরম সাংঘর্ষিক ধর্মমতে স্রষ্টার সংজ্ঞা কখনও এবং কোনো সময় এক হতে পারে না। এ ধরনের ভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের অনুসারী হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের সাথে মুসলমানদের মিলিয়ে ফেলা এবং সকলকে এক জাতি অনুভব করা সর্বধর্ম সমন্বয়ের একটি কুট কৌশল মাত্র। যা মুসলমানদের ঈমান বিনাশী একটি পদক্ষেপ।

ওয়াফদে নাজরান :

কোয়ান্টামের এই অপকীর্তির বৈধতা দেওয়ার জন্য নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর যুগের ঐতিহাসিক একটি ঘটনাকে বিকৃত করে উপস্থাপন করেছে কোয়ান্টাম। ঘটনাটি নাজরানের খ্রীষ্টান প্রতিনিধি দলের মসজিদে নববীতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে সাক্ষাৎ সংক্রান্ত। নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক পত্র মারফত ইসলাম গ্রহণের আহবানে সাড়া দিতে ওই দলটি মদীনায় এসেছিল। ইসলাম গ্রহণের পরিবর্তে তারা কর আদায়ের শর্তে শান্তি চুক্তি করে ফিরে গিয়েছিল। ইসলাম গ্রহণের আহবানে সাড়া দিতে আসা নাজরান খ্রীষ্টান দলের সাথে নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাক্ষাতের ঘটনা দিয়ে কোয়ান্টাম সকল ধর্মের সত্যতা প্রমাণ ও সকল ধর্মের মঙ্গলের জন্য এক সাথে কাজ করার বৈধতা প্রমাণ করেছে। (হাজারো প্রশ্নের উত্তর - ১/৫১)

নাজরানের প্রতিনিধি দলের আগমণ সংক্রান্ত সঠিক ইতিহাস জানতে সূরা আলে এমরান ৬১-৬২ নং আয়াতের তাফসীর, বুখারী শরীফের হাদীস এবং ইবনে কাসীর (রহ.) রচিত আলবেদায়া ওয়াননেহায়া দেখা যেতে পারে। তাতে সর্বধর্ম সমন্বয়ে কোয়ান্টামের ইতিহাস বিকৃতির চিত্র পরিষ্কার বুঝে আসবে।

আলেম সমাজের প্রতি বিদ্বেষ : ভয়াবহ পরিণতির দিকে সমাজ

মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন

বর্তমান সমাজে বিশেষত: সুশীলসমাজে যেভাবে আলেম ওলামা তথা দ্বীনের ধারক বাহকদের হেয় প্রতিপন্ন করা হচ্ছে, বিরোধীতার বস্তুতে পরিণত করা হয়েছে গোটা মুসলিম উম্মাহর কর্ণধারদের, অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় এক শ্রেণীর লেখক বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদদের ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে আলেম উলামাদের প্রতি কাদা ছোড়া ও তাদেরকে আক্রমনের টার্গেট বানানো। কোথাও কোনো অনুষ্ঠানে কিছু লোক একত্রিত হয়ে আলোচনার শুরুতেই চাই সেই আলোচনা দেশীয় রাজনীতি নিয়ে হোক বা আন্তর্জাতিক অঙ্গন নিয়ে হোক অল্পক্ষনের মধ্যেই আলোচনার মোড় ঘুরে মুসলিম উম্মাহর অধ্ব:পতন অত:পর এর জন্য পুরো দায়ভার ওলামায়ে কেরামের উপর বর্তানোর হিড়িক পড়ে যায়। যেমনটা মনে হয় মুসলমানদের সামগ্রিক অধব:পতনের সব দায় দায়িত্ব এককভাবে শুধু নিরীহ ওলামায়েকেরামই নিয়ে নিয়েছেন।

সাধারণত: ওলামায়েকেরামকে জনসাধারণের নিকট এমনভাবে চিত্রিত করা হয় যে, সমাজের মধ্যে যত ব্যতিক্রম বা মন্দ কাজ, খুন খারাবী সন্ত্রাস ইত্যাদি যা কিছুই হয় সব কিছুর জন্য আলেম সমাজই দায়ী। মৌলভী /মাদরাসা পড়ুয়ারা যদি না থাকত গোটা সমাজ শান্তিতে বসবাস করত এবং পূরো সমাজ সমস্ত অস্থিরতা, অশান্তি থেকে মুক্ত থাকতো।

এই জঘন্য হীনমন্যতাকে বর্তমানে সমাজের বিশেষ একটা গোষ্ঠী ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ওলামা বিদ্বেষের নবরূপ হিসাবে খাড়া করে সুপরিকল্পিত পন্থায় আলেম সমাজকে হেয়প্রতিপন্ন করার চক্রান্ত করা হচ্ছে। যাতে সাধারণ নির্বোধ মুসলমানেরা তাদের থেকে দূরে সরে যায়। এবং জনসাধারণের উপর আলেম, ওলামার যেই প্রভাব রয়েছে তা যেন সমূলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

এই বিশেষ পরিকল্পনা নিয়েই বিশেষ কিছু প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া দাড়ি, টুপি এবং দাড়ি টুপি ওয়ালাদের ঘায়েল করার বৈচিত্রময় লেখা, কার্টুন ইত্যাদি সদা সর্বদা প্রচার করতে থাকে। যেখানে ওলামায়ে কেরামকে বিদ্রোপ করা হয় বিভিন্ন উপায়ে। চাপিয়ে দেওয়া হয় যে কোনো অপবাদ অনায়াসে। কখনো বা তাদেরকে হাঁসির খোরাক বানানো হয় দাড়ি টুপি দিয়ে, আবার কখনো লাঞ্ছনার পাত্র বানানো হয় তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতাকে পুঁজি করে।

আমাদের দেশের অনেক মিডিয়া কর্মী ও রাজনীতিক তো এমনও আছেন যারা এই ঘৃণ্যতম কাজে শুধু পাকা বা সিদ্ধহস্ত তা নয় বরং এমন কোনো লেখাই তারা লিখতে পারেন না বা কোনো জনসভা, কোনো ফোরাম ও টকশোতে বক্তৃতা বিবৃতি দিতে পারেন না যেখানে আলেম ওলামাদেরকে কটাক্ষ করা হয় না। তাদের প্রতি চরম বিদ্বেষ ফুটে ওঠে না। ভাল লাগে না তাদের মাদরাসা মসজিদ। খারাপ লাগে তাদের দাড়ি টুপি, বিরক্তি লাগে দাড়ি টুপি ওয়ালা, মাদরাসা শিক্ষক, শিক্ষার্থী, মসজিদের ইমামসহ দ্বীনের কর্ণধারদের।

ইরাকে ইঙ্গমার্কিনীদের হামলা নিয়ে আলোচনা হোক বা আফগানিস্তান নিয়ে হোক, পাকিস্তানের অস্থিরতা হোক বা হিন্দুস্থানের সন্ত্রাসী হামলা নিয়ে। আমাদের দেশের সামাজিক বিষয়ে হোক বা আন্তধর্মীয় কোনো বিষয়ে, মুসলমান হোক বা অমুসলমান/ হিন্দু বৌদ্ধদের বিষয়ে হোক সর্বোপরি তাদের কলমের দুচার খোঁচা এবং তাদের মুখের বিকৃত অপবাদ থেকে রেহায়ী মিলে না আলেম ওলামাদের, দাড়ি টুপি ওয়ালাদের।

যদি কেউ তাদের জিজ্ঞেস করে কিই বা অপরাধ? আলেমদের, কি অন্যায় করেছে তারা? ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়াই কি তাদের অপরাধ? সাধারণ মুসলমানদেরকে ধর্মীয় দিক নির্দেশনা দেওয়ার মত গুরুদায়িত্ব পালন করাই কি এতবড় জঘণ্য অপরাধ? যে তাদেরকে ঘৃণা করা হবে? মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা, মাদরাসা পরিচালনা করা এবং সেখানে মুসলমানদের ছেলে মেয়েদের কুরআন ও হাদীসের পবিত্র বাণী শিক্ষা দেওয়া কি কোনো কানুন ও আইন বিরোধী কর্মকাণ্ড? নাকি আদর্শ বিচ্যুত কোনো কাজ? যদি উল্লেখিত কোনোটাই অন্যায়, অপরাধের সীমানায় না পড়ে প্রচলিত আইন পরিপন্থীও না হয়, তাহলে কেনইবা তারা এত নির্যাতন ও গালমন্দের টার্গেট?

অথচ সমাজের মধ্যে ইসলামের অমীয় বাণী প্রচার করা এবং ইসলামের ভিতকে মজবুতভাবে দৃঢ় করার জন্য সমাজে ওলামায়ে কেরামের অবস্থান ও অস্তিত্ব অপরিহার্যতার দাবী রাখে। এরাই তো সমাজকে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড থেকে বাঁচিয়ে শান্তির দিকে আহবান করে সদা সর্বদা। পাপ পঙ্কিলতা পরিহার করে আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জনের মানসে ডাক দেয় কল্যাণের পথে। সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে অদ্যাবদি এই দল ছিল, আছে, কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে

ইনশাআল্লাহ, ইসলাম ও মুসলমান দুশমনদের হাজারো বিরোধিতা ও ষড়যন্ত্র সত্বেও। এরা তো ওই দল যাদের ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন "এবং তোমাদের মধ্যে এমন একদল লোক থাকা জরুরী যারা কল্যাণের দিকে আহবান করবে এবং ভাল কাজের নির্দেশ দিবে, খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করবে এবং এই দলই সফলকাম। (সূরা আলে ইমরান আয়াত ১০৪)

কতইনা দুর্ভাগ্য আমাদের যে, আমরা ওই দলের লোকদেরকে গালমন্দ করছি, যতেচ্ছ মন্তব্য ছুঁড়ে দিচ্ছি তাদের প্রতি, যারা সর্বদা মানুষের মধ্যে আল্লাহর দ্বীন প্রচারে নিয়োজিত এবং যার মাধ্যমে কুরআন, সুন্নাহর বিধানাবলী মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) একদা এক ওয়াজের প্রাক্কালে এই ধরনের লোকদের কে সম্বোধন করে বলেন, আমি ওলামা বিদ্বেষীদের নিকট জানতে চাই, সমাজের মধ্যে ওলামায়ে কেরাম থাকা জরুরী কি না? উত্তরে তারা যদি বলে সমাজে আলেমদের উপস্থিতির কোনো প্রয়োজন নেই, তাহলে আমি বলব তাদের ইসলামেরও প্রয়োজন নেই। কারণ আলেম সমাজ ছাড়া দ্বীন ঠিকে থাকতে পারে না। যেহেতু কোনো পেশা টিকতে পারেনা ও পেশার বিজ্ঞজন ছাড়া। মাওয়ায়েজে দাওয়াত ও আবদিয়ত ১২/৫৩)

দ্বীনের এই বিশেষজ্ঞরা কোথায় তৈরী হবে? স্বীকৃত কথা হলো এরা মাদরাসায় তৈরী হবে। সুতরাং দ্বীনের জন্য মাদরাসার অস্তিত্ব অপরিহার্য একটা বিষয়। হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) একদা ইরশাদ করেন যে, এতে কোনো সন্দেহের নূন্যতম অবকাশ নেই যে, বর্তমান সময়ে ধর্মীয় শিক্ষাদীক্ষার জন্য মাদরাসার অস্তিত্ব মুসলিম উম্মাহের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত এমন এক বড় নেয়ামত, এর চেয়ে বড় আর কোনো নেয়ামতের কল্পনাও করা যায় না। দুনিয়াতে ইসলাম ধর্ম টিকে থাকার যদি কোনো পদ্ধতি থাকে তা একমাত্র মাদরাসা। কেননা ইসলাম নাম হলো এমন কিছু বিশেষ আকিদা ও আমলের যাতে ধর্মীয় বিষয়, দৈনন্দিন লেনদেন, সমাজ ব্যবস্থা ও চরিত্র গঠন ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। বাস্তব সত্য হলো আমল নির্ভর করে ইলমের উপর আর ধর্মীয় ইলম টিকে থাকা এবং এর সুষ্ঠু বিকাশ, প্রচার ও প্রসার বিশেষত: বর্তমান সময়ে মাদরাসা নির্ভর। হুকুকুল ইলম ৮৪)

তিনি অন্যত্র আরো বলেন, যেভাবে বল্গাহীন স্বাধীনতাও ধর্মহীনতা সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়ছে আমার ধারণা মতে তার মোকাবিলার জন্য তদ্রুপ মাদরাসার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াও জরুরী। (হাকীমুল উম্মত ১০১)

একদা তিনি বলেন, কারো প্রশ্ন জাগতে পারে যে আম্বিয়ায়ে কেরামের যুগে তো মাদরাসা ছিলনা, সুতরাং মাদরাসা অহেতুক ও বেকার? তিনি বলেন এধরনের প্রশ্ন একেবারেই অবান্তর। বরং মাদরাসা হলো নামাযের জন্য অজুর তুল্য। যেমনটা নামাজের জন্য অজু করা বাধ্যতামূলক তদ্রুপ ধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য মাদরাসার অস্তিত্বও বাধ্যতামূলক। (আততাবলীগ ২০/২৩)

উলামায়ে কেরামকে ওই সমস্ত লোকেরাই গালমন্দ করে এবং ওলামা বিদ্বেষের এলার্জি ওই সব লোকদের যারা না ধর্ম সম্পর্কে অবগত না ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত, যারা নামে মাত্র মুসলমান, যারা ইসলামকে পরিপূর্ণ জীবন বিধান মনে করে না এবং ইসলামের শ্বাসত বিধান মতে নিজের জীবন পরিচালনা করে না। যদি তারা ইসলামকে ওই হিসাবে গ্রহণ করতো যা ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবন, সামাজিক জীবন থেকে শুরু করে সর্বস্তরের সমস্যার সমাধান নিশ্চিত করে এবং তার পরকালিন কল্যানের নিশ্চয়তাও প্রদান করে। যদি তারা ইসলামকে সংকীর্ণভাবে মূল্যায়ন না করে বরং ইসলামের ব্যাপকতা উপলব্ধি করার চেষ্টা করতো তবে তারা অবশ্যই বলতো যে, সমাজের মধ্যে এমন ওলামায়ে কেরামের উপস্থিতি নেহায়েত জরুরী যারা ইসলামের বিধিবিধানের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে এবং সমাজের মধ্যে তার সুষ্ঠু ও সুন্দর বাস্তবায়নের যোগ্যতা রাখবে এবং ইসলামের খিদমতে সদাসর্বদা নিয়োজিত থাকবে।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার প্রিয় হাবীব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার সর্ব শেষ ও সর্ব শ্রেষ্ঠ নির্বাচিত ধর্ম ইসলাম দিয়ে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি দুনিয়াতে আগমন করলেন এবং তার উম্মতদের হাতে মহান আল্লাহর সর্ব শেষ কিতাব পবিত্র কুরআনকে তুলে দিলেন। তেইশ বৎসরের (মক্কী ও মাদানী) নববী জিন্দেগীতে আল্লাহ প্রদত্ব শরীয়তের এক একটা বিধানকে আল্লাহর বান্দাদের নিকট পৌছিয়ে দিলেন। তিনি তার নবুওয়াতের দায়িত্ব পরিপূর্ণ করার পর এর রক্ষণাবেক্ষনের গুরুদায়িত্ব বর্তায় একমাত্র ওলামায়ে কেরামের উপর। তাইতো উম্মতের উলামায়ে কেরামকে স্বয়ং মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম) আম্বিয়ায়ে কেরামের ওয়ারিস আখ্যা দিয়েছেন। এই উত্তরাধিকারিত্ব ধন সম্পদের নয় বরং আম্বিয়ায়েকেরামের ইলমের। পূর্বেকার উম্মতের ওলামাদের মত এই উম্মতের ওলামারাও মুহাম্মদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উলূমের ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী।

পবিত্র কুরআন ও হাদীসে ওলামায়ে কেরামের ও ইলমের অসংখ্য ফজীলতের কথা এসেছে। এবং সমস্ত মুফাসসিরগণ একথার উপর একমত যে, পবিত্র কুরআন ও হাদীসের যেখানেই ইলমের আলোচনা এসেছে সেখানেই ইলম বলে ইলমে দ্বীন বা ধর্মীয় শিক্ষাকেই বুঝানো হয়েছে। পবিত্র কুরআনের এক আয়াতে ধর্মীয় শিক্ষা বা দ্বীনি ইলমকে মহান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ বা ফজল বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, মহান আল্লাহ আপনাকে এমন বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন যা আপনি যানতেন না। আপনার প্রতি আল্লাহর করুণা অসীম।" (সূরা নিসা আয়াত ১১৩)

পবিত্র কুরআনে অন্য আয়াতে ইলম ও হিকমতকে প্রভূত মঙ্গল ও কল্যাণকর আখ্যা দিয়ে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন "আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা বিশেষ জ্ঞান দান করেন এবং যাকে বিশেষ জ্ঞান দান করা হয় সে প্রভূত কল্যাণকর বস্তুপ্রাপ্ত হয়।" (সূরা বাকারা ২৬৯)

উপরোক্ত আয়াতে এই কথাই বলা হয়েছে যে, দ্বীনি ইলম তথা ধর্মীয় জ্ঞানের এই অমূল্য সম্পদ যে কেউ পায় না বরং মহান আল্লাহর বিশেষ করুণা যাদের উপর হয় তারাই একমাত্র প্রাপ্ত হয়। অন্যরা রয়ে যায় বঞ্চিত।

পবিত্র কুরআনের অন্য আয়াতে আলেম ও মুর্খের পার্থক্য করা হয়েছে এভাবে-

"আপনি বলুন যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে?" (সূরা যুমার আয়াত ৯)

পবিত্র কুরআনের অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যারা জ্ঞান প্রাপ্ত আল্লাহ তাদের মর্যাদা উচচ দরে দিবেন।" (সূরা মুজাদালা আয়াত ১১)

বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ তাফসীরে রূহুল মা'আনীর লিখক আল্লামা আলূসী বাগদাদী (রহ.) লিখেন আতফের হরফ (সংযোজন অক্ষর) দ্বারা সাধারণ মুমিনদের থেকে আহলে ইলম ঈমানদারদেরকে পৃথক করে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হল আলেমদের সম্মান বুঝানো। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন মহান আল্লাহ উক্ত আয়াত দ্বারা ওলামায়ে কেরামের যেই বৈশিষ্ট বর্ণনা করেছেন পুরো কুরআনে এর দৃষ্টান্ত অনুপস্থিত।

মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক হাদীসে ইরশাদ করেন ইলমের মর্যাদা ও ফজীলত ইবাদতের তুলনায় অনেক বেশি। জমউল ফাওয়ায়েদ হাদীস নং ১৭৯, উপরোক্ত মর্যাদা ও ফজীলতের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে স্বয়ং নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অন্য হাদীসে একটা উপমা দিয়ে বলেন। আলেমের মর্যাদা সাধারণ আবেদ তথা ইবাদত পালনকারীর উপর এরকম যেমন আমার মর্যাদা তোমাদের মধ্য থেকে সাধারণ ব্যক্তির তুলনায় বেশী। (তিরমিযী হাদীস নং ২০৬৮৫)

মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর কর্মকাণ্ড দ্বারাও প্রমাণ করেছেন যে, সাধারণ ইবাদত পালনকারী ঈমানদারের তুলনায় ওই সমস্ত লোকেরা উত্তম যারা ধর্মীয় ইলমের সাথে নিজেকে ব্যস্ত রাখে। একটি হাদীস দ্বারা তার প্রমাণ পেশ করা যায়। এক দিন মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মসজিদে নববীতে তাশরীফ আনলে, তিনি দেখতে পেলেন, সাহাবায়ে কেরামের দুই দলকে একদল ইলম শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা দানে ব্যস্ত, অপর দল আল্লাহর যিকির ও দোয়ার মধ্যে মশগুল। তখন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করলেন, উভয় দল ভাল কাজে ব্যস্ত। এই দল তো মহান আল্লাহর স্মরণে ব্যস্ত রেখেছে নিজেদেরকে। অপর দল ইলম শিক্ষা দেওয়া ও নেওয়ার মধ্যে নিজেদেরকে আত্মনিয়োজিত রেখেছে। এই দলই অপর দলের উত্তম। কেননা আমাকে নবী হিসাবে প্রেরণ করার উদ্দেশ্যও শিক্ষা দেওয়া। এবং মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই দলের সাথেই বসে পড়লেন। (ইবনে মাজাহ ১/৮৩, হাদীস নং ২২৯)

বর্তমান যুগে যারা ওলামায়ে কেরামের নেতৃত্বকে উপহাস করে অবশ্যই তাদের সামনে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পবিত্র এই ইরশাদ অনুপস্থিত। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, আল্লাহর জমিনের উপর ওলামায়ে কেরামের উপমা আসমানের নক্ষত্রের ন্যায়। আসমানের উজ্জল নক্ষত্ররাজী দ্বারা যেমন জল ও স্থলের অন্ধকারে আলোর দিশা পাওয়া যায়, নক্ষত্র অস্ত গেলে পথিক রাস্তা হারিয়ে ফেলার প্রবল সম্ভাবনা থাকে। (মুসনাদে আহমদ হাদীন সং ২১৮৯)

ওলামায়ে কেরামের মর্যাদার জন্য এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে? উক্ত হাদীসে তাঁদেরকে আকাশের নক্ষত্রের সাথে তুলনা করা হয়েছে। যাদের প্রদর্শিত পথেই মানুষ তাদের জীবনের দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়। যারা মানব জীবনের জন্য আলোর দিশারী। এই সমস্ত ওলামায়ে কেরামই পথ হারা মানব জাতিকে মঞ্জিলে মকসূদ পর্যন্ত পৌঁছায় এবং গোমরাহীর গভীর অন্ধকার থেকে হেদায়াতের আলোতে আলোকিত করে। আমরা যদি তাদের প্রতি বিদ্বেষ প্রবণ হয়ে এই প্রজ্জ্বলিত আলো নিভিয়ে দেওয়ার জন্য আধাজল খেয়ে নেমে পড়ি আমাদের সমাজ থেকে অন্ধকার নির্বাসিত হওয়ার উপায় কি?

উলামা বিদ্বেষী বন্ধুদের উচিত উলামায়ে কেরামকে যথেচ্ছ ও যত্রতত্র যেনতেন ভাবে ঘায়েল করার পূর্বে মহানবী

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর একটা ইরশাদকে সামনে রাখা –

মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, তিন ধরনের ব্যক্তি নিয়ে বিদ্রুপ ও উপহাস মোনফেকরা ব্যতীত অন্যরা করতে পারে না। ১। বৃদ্ধ মুসলমানের ২। আলেম এর ৩। ন্যায় পরায়ন শাসকের। (জমউল ফাওয়ায়েদ হাদীস নং ২০০)

অন্য এক হাদীসে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে ইরশাদ করেন, যারা উলামায়ে কেরামের সাথে শত্রুতা রাখে তাদের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করে তাদের জন্য জঘন্য ধিক্কার উচ্চারিত হয়েছে।

মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, তোমরা হয়তো ইলম শিক্ষাদাতা হও নতুবা শিক্ষার্থী। ইলমের কথা শ্রবণকারী হও নতুবা তাদেরকে ভালবাস। উল্লেখিত চার প্রকার ছাড়া পঞ্চম প্রকারের হয়ো না। অন্যথায় তোমরা ধ্বংস হয়ে যাও। (জমউল ফাওয়ায়েদ হাদীস নং ১৯৯)

পঞ্চম প্রকারের লোকতো ওরাই হতে পারে যারা আলেম ওলামাকে হেয় প্রতিপন্ন করে। এবং তাদের প্রতি ঘৃণা, হিংসা, বিদ্বেষ রাখে। কথায় কথায় মৌলবাদের দোহাই তুলে সন্ত্রাসের অপবাদ দিয়ে ফিৎনা ফ্যাসাদের মূল হোতা বানিয়ে অশ্লীল ভাষায় গালমন্দ করে ও বিভিন্ন অপবাদের প্রলয় বয়ে দেয় সাধ্যমতে। উল্লেখিত হাদীস তাদের জন্য আয়নার মত।

ইসলাম বিদ্বেষী বন্ধুগণ! ওলামায়ে কেরামরাও তো আপনি আমার মত মানুষ। তাদেরও বিভিন্ন ধরনের ত্রুটি বিচ্যুতি হতে পারে। যা অসম্ভব কিছু নয়। তাদের মধ্য থেকে কারো ভুল ত্রুটির জন্য পুরো সমাজকে দায়ী করা কি বুদ্ধিমানের কাজ? অবশ্যই নেহায়েত নির্বুদ্ধিতা। কারণ কোনো একজন ডাক্তার, উকিল, ইঞ্জিনিয়ার যদি কোনো ভুল সিদ্ধান্ত দেয় এর দ্বারা ওই পেশায় নিয়োজিত সবাইকেতো আর দোষী করা যাবে না। সবাই তো সমাজের খারাপ হয়ে যাবে না। সবাই তো সমাজের, দেশের, মানবতার শত্রু হতে পারে না। তাহলে ওলামায়ে কেরামের শানে কেন এই দ্বিমুখী নীতি? হতে পারে কোনো আলেম আপনার পছন্দের না, বা কোনো অন্যায় কাজে জড়িত কিন্তু কোনো একজনের উপর অনুমান করে সমস্ত ওলামাদের দোষারোপ করা কোন ইনসাফ বা ন্যায়ের কথা হলো? এটা মহাপাপ।

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেন, আলেমদের বিরোধিতাই অনেক সময় গোনাহ হয়ে যায়। এবং সাধারণ মুসলমানদের উপর বিরোপ প্রভাব পড়ে। তাদের মধ্যে আলেমদের প্রতি খারাপ ধারণা সৃষ্টি হয়। তাই কাউকে যদি সংশোধনও করতে হয় তার অপকর্ম থেকে ফিরিয়েও আনতে হয়, ভদ্রতার সহিত তাকে অবহিত করাই যথেষ্ট। নিজে আলেমদেরকে সম্মান হানি করা যেমন অপরাধ তদ্রুপ অসম্মানকারীকে সমর্থন করাও সমান অন্যায়। (হুকুকুল ইলম পৃ: ৯৬)

বিশিষ্ট ফক্বীহ হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.) এই বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) এর দুইটি বাণী উল্লেখ করেছেন। সমালোচকদের উচিৎ ঠাণ্ডা মাথায় ওই দুটো বাণীর মর্ম বুঝে নিজের কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করা। তিনি বলেন, ধর্মের স্বার্থের চাহিদা হলো আলেম সমাজের সাহায্য ও সহাযোগিতা করা যদিও তাদের মধ্যে কেউ বদ আমল হয়। কেননা যদি সাধারণ পাবলিকের অন্তর থেকে ওলামাদের সম্মান হারিয়ে যায় তাহলে দ্বীন ও ধর্মের ইতি হয়ে যাবে। কারণ তখন জনসাধারণ আলেম সমাজের কথার প্রতি কর্ণপাতও করবে না। (মজালিসে হাকীমুল উম্মত পৃ: ১৩১)

হযরত থানভী (রহ.) তো আরো একধাপ এগিয়ে লিখেছেন আমলহীন আলেম ও সম্মানের পাত্র। তিনি বলেন, সাধারণ পাবলিকের উচিত বেআমল আলেমকেও হেনস্ত না করা। তাকে অপদস্ত না করা বরং যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা। (আদাবুল মুতাআল্লিমীন পৃ: ১১১)

সার কথা:

ওলামা বিদ্বেষ যাদের পেশা কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য ছোঁড়া যাদের নেশা, আলম সমাজকে হেয় প্রতিপন্ন করা যাদের নিত্য দিনের খোরাক, দ্বীনের খাদেমদেরকে তাচ্ছিল্য করা যাদের রুটিন ওয়ার্ক, যারা হালাল করে নিয়েছে ওলামাদের গোশত ভক্ষনকে, তাদের খেদমতে ভারাক্রান্ত হৃদয়ের উল্লেখিত পর্যালোচনা। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, এক শ্রেণীর লেখক, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিক আলেমসমাজের দুর্নাম ও কুৎসা রটনার মত জঘণ্য অপরাধে জড়িত এবং যারা দ্বীনের পথে অগ্রসরমান তাদেরকে তুচ্ছ করাই তাদের ব্যস্ততা। কতইনা ভাল এবং মঙ্গল জনক হতো যদি আমরা একে অপরের প্রতি হিংসা পরিহার করে নিজেদের পরকালীন কল্যাণের প্রতি মনোযোগী হই। আসন্ন ভয়াবহ পরিণতি থেকে পরিত্রাণের উপায় হতো। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

স্মরণ
আওলিয়া জীবন

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত
মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী রহ.

আবু নাঈম মুফতী মুঈনুদ্দীন

জন্ম, বাল্যকাল, প্রাথমিক শিক্ষাঃ

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী রহ. মাহে শাবান ১২৪৮ হিজরী মোতাবেক জানুয়ারী ১৮৩৩ ঈসায়ী ভারতের সাহারানপুর জিলার অন্তরগত নানুতাহ এলাকার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শেখ আসাদ আলী সিদ্দীকী। তাঁর বংশ পরিক্রমা ৪৬সুত্রে ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. এর সাথে মিলিত হয়।

তিনি বাল্যকাল থেকেই মেধাবী, উচ্চ সাহসী, পরিশ্রমী, দুরন্ত, বিচক্ষণ এবং বুদ্ধিমান ছিলেন। মকতবে সব পরীক্ষায় তিনি সাথীদের মধ্যে ১ম স্থানে থাকতেন। অল্পসময়ে তিনি কুরআন মজিদ খতম করেন। বাল্যকাল থেকেই তাঁর হস্তলিপি সুন্দর ছিল।

নানুতাহ থেকে দেওবন্দঃ

তিনি নানুতাহর মকতবে কুরআন শিক্ষার পাশাপাশি ফারসী ভাষাও শিক্ষা করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ৯ বৎসর। এরপর বিভিন্ন কারণে তাঁকে দেওবন্দ পাঠানো হয়। সেখানে তিনি শায়খ কারামত হুসাইন রহ. এর বাড়ীতে হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. এর বড় আববা হযরত মাওলানা মাহতাব আলী রহ. এর নিকট মীযান মুনশায়িব, নাহবেমীর , পাঞ্জেগাঞ্জ ইত্যাদি কিতাবাদী পড়েন। এরপর সাহারানপুরে তাঁর নানাজান মাও. ওয়াজীহুদ্দীন রহ. এর নিকট হেদায়াতুন্নাহু এবং কিছু ফারসী কিতাবাদী পড়েন।

দিল্লির এরাবিক কলেজেঃ

এরপর ৪ঠা মুহাররম ১২৬০ হিজরী মোতাবেক ১৮৪৪ ঈসায়ীতে তিনি দিল্লির প্রসিদ্ধ এরাবিক কলেজে ভর্তি হন। আরবী গ্রামার নাহু শাস্ত্রের কিতাব কাফিয়া থেকে পড়া শুরু করেন। সেখানে তাঁর উল্লেখযোগ্য উস্তাদদের মধ্যে ছিলেন হযরত মাওলানা মামলূক আলী রহ. ও মাওলানা মুফতী সদরুদ্দীন রহ. । তবে অধিকাংশ কিতাব তিনি হযরত মাও. মামলূক আলী রহ. এর নিকট পড়েন। এবং সিলেবাসের বাহিরের গুরুত্বপূর্ণ কিতাবাদী ও তিনি মাও. মামলূক আলী রহ. এর নিকট তাঁর বাড়ী গিয়ে পড়তেন।

কলেজ বর্জনের অভিনব ঘটনা: হযরত মাও. কাসেম নানুতবী রহ. ছিলেন উক্ত কলেজে আরবী বিভাগের ফার্ষ্ট বয়। যে বছর তাঁর কলেজজীবন শেষ হবে সে বছর তিনি খুব পরিশ্রম করে কিতাবাদী অধ্যয়ন করেন। কিন্তু পরীক্ষার দিন তিনি পরীক্ষায় অংশগ্রহন না করে কলেজ বর্জন করলেন। এতে শিক্ষকরা বিশেষত হেড মাষ্টার সাহেব অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। এবং আফসোস করে বললেন: ছেলেটি ভাল একটা চাকুরী থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল এবং তার ভবিষ্যত সে নিজেই নষ্ট করে দিল। নানুতবী রহ. তাঁর শিক্ষকদের আক্ষেপের কথা শুনার পর বললেন: আমি তো চাকুরির জন্য আরবী পড়িনি। শুধু দ্বীন শেখার জন্যই আরবী পড়েছি বিধায় আমার কোনো আফসোস নেই।

হাদীস শিক্ষাঃ

তিনি আরবী কলেজ ত্যাগ করার পর হাদীসে নববী শিক্ষার জন্য ব্যকুল হয়ে পড়েন। তাই চিন্তা ভাবনা করে হাদিস শিক্ষার জন্য তিনি নির্বাচন করলেন তৎকালীন বিখ্যাত আলেম হযরত মাওলানা শাহ্ আব্দুল গনী মুজাদ্দেদী দেহলভী রহ. কে। একদিন তাঁর সাথী হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. সহ তাঁর দরসে উপস্থিত হন। এবং তাঁর নিকট সুনানে আবী দাউদ ব্যতীত সিহাহ ছিত্তার বাকী সব কিতাবাদী পড়েন। সুনানে আবী দাউদ পড়েন হযরত মাওলানা শাহ্ ইসহাক রহ. এ শাগরেদ হযরত মাও. আহমদ আলী মুহাদ্দিসে সাহানরপুরী রহ. এর নিকট।

বাইআত গ্রহণঃ

তিনি হাদীসে নববী শিক্ষালাভ করার পর আত্মাশুদ্ধির জন্য বাইআত গ্রহন করেন হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. এর নিকট। তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণ করার পর তাঁর মধ্যে আমলের পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। তিনি বেশি কথা বলতেন না। একাকিত্বকে পছন্দ করতেন। সদা সর্বদা জিকিরে মাশগুল থাকতেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন দরিদ্র সাধারণ কৃষক । তাঁর আশা ছিল ছেলে লেখাপড়া করে সরকারী চাকুরী করবে। এতে পরিবারে কিছুটা স্বচ্চলতা আসবে। একদা তাঁর পিতা হাজী সাহেব রহ. কে বললেন: ভাই! আমার একটি মাত্র সন্তান আমার আশা ছিল সে কামাই করে আমাদের সংসারের হাল ধরবে। জানি না আপনি তাকে কী মন্ত্র পড়ালেন সে তো কোনো কাজই করেনা। শুধু

এবাদতে মগ্ন থাকে। এভাবে কি সংসার চলে?অথচ আমাদের খান্দানের অনেক ছেলে তার সমবয়সী যারা সরকারী চাকুরী করে পিতা মাতার খেদমত করছে। যেমন মাও. ইয়াকুব নানুতবী রহ. মাও. আহমদ নানুতবী রহ. মাও. মাযহার নানুতবী রহ. মাও. আহসান নানুতবী রহ. প্রমুখ। হযরত হাজী সাহেব রহ. তাঁর পিতার বক্তব্য শুনে একটু মৃদু হেসে বললেন: ভাই! আপনার ছেলে কাসেমের মাধ্যমে আল্লাহ পাক এমন খেদমত নিবেন যে, তার সাথীগণ সবাই তার সামনে মাথানত করবে এবং তার প্রতি ঈর্ষা করবে। সে এতো প্রসিদ্ধি লাভ করবে যে, দেশের প্রতিটি প্রান্তে তার নাম ছড়িয়ে পড়বে। আল্লাহ পাক তাকে সরকারী চাকুরীর পরিবর্তে এত বেশী সচ্ছলতা দান করবেন যে, তার সাথীরা ঈর্ষান্বিত হয়ে যাবে।

قلندر ہر چہ گوید دیدہ گوید

বুযুর্গরা যা বলেন কাশফের মার্ধমেই বলেন। দেখা গেছে হযরত হাজী সাহেব রহ. এর কথা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়।

কর্মজীবনের সূচনা :

হযরত মাও. কাসেম নানুতবী রহ. ঘরের আর্থিক সঙ্কটের ব্যাপারে অবগত ছিলেন তাই তিনি হযরত হাজী সাহেব রহ. এর সুহবতে কিছুদিন কাটানোর পর দিল্লি চলে যান। সেখানে তার উস্তাদ হযরত মাওলানা আহমদ আলী সাহেব রহ. এর ছাপাখানায় কিতাব সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন বেতন নির্ধারণ করা হয় ১০রুপী। উল্লেখ্য যে, এটি যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে চাকুরী কিন্তু বাস্তবে তা চাকুরী নয় বরং দ্বীনের বিশাল একটি খেদমত। ছাপাখানার মালিক হযরত মাও. আহমদ আলী সাহারানপুরী রহ.এর উদ্দেশ্য ও ব্যবসা করা ছিলনা বরং হিন্দুস্থানে হাদিসের বিশেষত সিহাহ সিত্তার কিতাবাদীর প্রচার ও প্রসার করা।

সহীহ বুখারী শরীফের টীকা সমাপ্তিকরণ:

উক্ত ছাপাখানার মালিক শুধু প্রকাশকই ছিলেন না বরং যুগশ্রেষ্ট মুহাদ্দিস ও ছিলেন তাই তিনি যখন বুখারী শরীফ ছাপানোর উদ্যোগ নিলেন তিনি প্রয়োজন অনুভব করলেন যে, তার উপর টিকা ও লেখা হোক যেন আহলে ইলমদের জন্য উক্ত কিতাব দ্বারা উপকৃত হওয়া সহজ হয়। যে সময় হযরত নানুতবী (রহ.) কে সেখানে কাজ করার জন্য নিয়োগ দেওয়া হয় তখন শেষের পাঁচ পারার টীকা লেখা বাকী ছিল। এবাকী অংশের টীকা লেখার দায়িত্ব ও তার উপর ন্যস্ত করা হয়। হযরত নানুতবী রহ. তখন নতুন ফারেগ হওয়ায় অনেকে হযরত মাও. আহমদ আলী রহ.উপর অভিযোগ করেছেন যে, এতো বড় কাজ আপনি একজন নতুন মানুষের উপর সোপর্দ করলেন? কিন্তু যেহেতু তিনি হযরত নানুতবী রহ. এর ইলমী যোগ্যতা সম্পর্কে অবগত ছিলেন তাই প্রতি উত্তরে বললেন: আমি এতো বোকা না যে, না বুঝে একাজ করবো। যখন তাদেরকে হযরত নানুতবীর টীকা দেখালেন তখন তারা একেবারে চুপ হয়েগেল।

হিন্দুস্থানের আযাদী আন্দোলনের সূচনা:

ইংরেজরা হিন্দুস্থানে পা রাখার পর থেকেই হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহ.) প্রত্যক্ষ করলেন যে তারা ইসলাম সহ অন্যান্য ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করে খৃষ্ট ধর্ম প্রচার-প্রসার করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। তখন থেকেই তিনি অন্যান্য ওলামায়ে কিরামের সাথে পরামর্শ করে তাদের প্রতিরোধ করার তদবীর শুরু করলেন। এর জন্য তখন একটি বিপ্লবী জামাত গঠণ করা হয়। তার তৃতীয় ইমাম হলেন হযরত শাহ আব্দুল গণী মুজাদ্দেদী রহ.। ১৮৪৬ সালে তিনি ইন্তিকাল করলে হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. ৪র্থ ইমাম নিযুক্ত হন। তার নেতৃত্বে শামেলীর ময়দানে ইংরেজদের বিরোদ্ধে হিন্দুস্তান আযাদীর জন্য জিহাদ ঘোষণা করা হয়। এতে চীফ কামান্ডার সেনাপতি) নিযুক্ত হন হযরত কাসেম নানুতবী (রহ.)এবং বিচারপতি নিযুক্ত হন হযরত মাও. রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.) এভাবে থানা ভবনকে দারুল ইসলাম ঘোষণা করে তারা এগিয়ে যান। এই জিহাদে হযরত মাও. ইসমাঈল শহীদ (রহ.) শাহাদাত বরণ করেন।

গ্রেফতারী পরওয়ানা :

এ জিহাদে প্রথম দিকে মুসলমানগণ জয়লাভ করলেও পরিশেষে ইংরেজ সৈন্যরা থানাভবন ঘেরাও করে ফেলে এবং ব্যাপকভাবে মুসলমানদের উপর হত্যাযজ্ঞ চালায় এবং ঘরে তেল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয় রাতের মধ্যেই থানাভবন ভস্ম হয়ে যায়। হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. মাও. কাসেম নানুতবী রহ. এবং মাও . রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. এর বিরোদ্ধে গ্রেফতারীর ওয়ারেন্ট জারি হলে হযরত হাজী সাহেব (রহ.) মক্কায় হিজরত করেন। এবং হযরত গাঙ্গুহী রহ. গ্রেফতার হন্ হযরত কাসেম নানুতবী রহ. দোস্ত আহবাবের পীড়াপীড়িতে তিন দিন আত্মগোপন করেন। তিন দিনপর আত্মপ্রকাশ করেন এবং ওপেন চলাফেরা করেন। এবং বললেন তিন দিনের অতিরিক্ত আত্মগোপন করা সুন্নাত পরিপন্থী কেননা রাসুল সা. হিজরতের সময় ছুর গুহায় তিনদিন পর্যন্ত আত্মগোপন করেছিলেন।

দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা:

উল্লেখিত পরিস্থিতিতে জাতীর কান্ডারী হযরত মা. কাসেম নানুতবী রহ. এমন একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন যে প্রতিষ্ঠান জন্ম দিবে এমন আলেমে দ্বীন যারা জন্মগত ভাবে ভারতী হলেও ঈমান আকীদা আখলাক চরিত্রে হবেন সাহাবায়ে কেরামের নমুনা। তাই তিনি কোনো সময় দেওবন্দ শ্বশুরালয়ে এলে স্থানীয় জনাব হাজী আবেদ হুসাইন রহ. সহ অন্যান্য বুযুর্গদের সাথে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মত বিনিময় করতেন। ১২৮৩ হি. মোতাবেক ১৮৬৬ ঈসায়ী সনে একদিন এশরাকের সময় জনাব হাজী আবেদ হুসাইন সাহেব ১টি সাদা রুমালের থলে বানিয়ে তিনি সেখানে তিন রুপী রাখলেন তারপর মাও. মাহতাব আলী রহ. এর নিকট গেলে তিনি ৬ রুপী দিলেন এবং দু'আ করলেন। এবং মাও. ফজলুর রহমান সাহেব রহ. ১২ রুপী দিলেন। মাও. ফজলুল হক সাহেব দিলেন ৬ রুপী এবং শায়খুল হিন্দ রহ. এর পিতা মাও. যুলফিকার আলী রহ. দিলেন ১২ রুপী এভাবে সন্ধ্যা পর্যন্ত ৩০০ রুপী জমা হলে হাজী সাহেব হযরত নানুতবী রহ. এর নিকট এমর্মে পত্র লিখলেন যে, আপনি যে মাদ্রাসা করতে চাইতেছেন তার জন্য ৩০০ রুপী জমা করেছি আপনি এসে মাদ্রাসা শুরু করার ব্যবস্থা করুন। এরপর ১৫ ই মুহাররম ১২৮৩ হিজরী মোতাবেক ৩০ মে ১৮৬৬ ঈসায়ী রোজ বৃহ: এক উস্তাদ মোল্লা মাহমুদ দেওবন্দী ও এক ছাত্র মাহমুদ হাসান দেওবন্দী কে দিয়ে ছাত্তা মসজিদে দারুল উলুম দেওবন্দের সূচনা হয়।

গুণাবলী: তার গুণাবলীর মধ্যে অকৃত্রিম স্বভাব, উদারতা, বিনয় নম্রতা, আতিথেয়তা এবং অতিথির যথোপযুক্ত সম্মান সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধে কাঠোরতা। অমুখাপেক্ষীতা অন্তর্দৃষ্টি ধীশক্তি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

ওফাত: অবশেষে এই মহাসাধক আলেমে রব্বানী ৪ঠা জুমাদুলউলা ১২৯৭ হি: মোতাবেক এপ্রিল ১৮৭৯ ঈসায়ী রোজ বৃহ: নিজ মওলার সান্যিধ্যে চলে যান। ওফাতকালে তার বয়স ছিল মাত্র ৪৯ বছর।

তথ্যসূত্র:

সাওয়ানেহে কাসেমী ১খন্ড

সাওয়ানেহে ওলামায়ে দেওবন্দ ২য় খন্ড

মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী রহ. হায়াত আওর কা-র না-মে হযরত নানুতবী রহ. কী মুখতাসার সাওয়ানেহে ওমরী

মাসিক আল-আবরারের গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলি

এজেন্ট হওয়ার নিয়ম

*	কমপক্ষে ১০ কপির এজেন্সি দেয়া হয়।
*	২০ থেকে ৫০ কপি পর্যন্ত ১টি, ৫০ থেকে ১০০ পর্যন্ত ২টি, আনুপাতিক হারে সৌজন্য কপি দেয়া হয়।
*	পত্রিকা ভিপিএল-এ পাঠানো হয়।
*	জেলা ভিত্তিক এজেন্টদের প্রতি কুরিয়ারে পত্রিকা পাঠানো হয়। লেনদেন অনলাইনের মাধ্যমে করা যাবে।
*	২০% কমিশন দেয়া হয়।
*	এজেন্টদের থেকে অগ্রীম বা জামানত নেয়া হয় না।
*	এজেন্টগণ যে কোন সময় পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করে অর্ডার দিতে পারেন।

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম

বার্ষিক চাঁদার হার

	দেশ	সাধ.ডাক	রেজি.ডাক
#	বাংলাদেশ	২০০	৩০০
#	সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৭২০	৯০০
#	মধ্যপ্রাচ্য	১০৮০	১২০০
#	মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া	১২০০	১৪০০
#	ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া	১৫০০	১৭০০
#	আমেরিকা	১৭০০	২০০০

১বছরের নিচে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক চাঁদা মনি অর্ডার, সরাসরি অফিসে বা অনলাইন ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠানো যায়।

সম্মানিত গ্রাহকদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, রেজিস্ট্রি ডাকই সকল গ্রাহকের জন্য উত্তম। কারণ সাধারণ ডাকে অনেক সময় ঠিকমত পত্রিকা পৌঁছে না।

জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান

কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা বাংলাদেশ

পরিচালনায় : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা।

প্রসঙ্গ : পুরুষের কাছে মহিলাদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ

নাসির মাহমূদ

ধর্মপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

জিজ্ঞাসা :

বর্তমান আধুনিক যুগ হিসেবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুরুষ-মহিলাদের জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণ আবশ্যক হয়ে পড়েছে। কিন্তু মহিলাদের জন্য মহিলা প্রশিক্ষকের মাধ্যমে কোর্স গ্রহণের সুযোগ সাধারণত পাওয়া দুস্কর। এমতাবস্থায় মহিলাদের জন্য বোরকা পরিধান করে পুরুষ শিক্ষার্থী বা অন্য কোনো পুরুষের সংশ্রবমুক্ত পরিবেশে কোনো পুরুষ প্রশিক্ষক থেকে কোর্স নেওয়া শরীয়ত সম্মত হবে কি না? বা এ ব্যাপারে মহিলা শিক্ষার্থীদের করণীয় কি তা জানিয়ে বাধিত করবেন।

সমাধান :

বর্তমান উন্নত বিশ্বে কম্পিউটার শিক্ষার গুরুত্ব অবশ্যই অনস্বীকার্য। এতদসত্বেও তা শরয়ী প্রয়োজনের আওতায় পড়ে না বিধায় প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে মহিলাদের জন্য বেগানা পুরুষ প্রশিক্ষক থেকে কম্পিউটার শিক্ষা গ্রহণ করা সম্পূর্ণ শরীয়ত পরিপন্থী এবং না জায়েয। এমতাবস্থায় কম্পিউটার শিক্ষায় আগ্রহী মহিলারা সম্ভব হলে অন্য মহিলা প্রশিক্ষক বা মাহরাম পুরুষ থেকে শিখে নিতে পারবে। অন্যথায় কম্পিউটার শিক্ষা বর্জন করবে। (সূরা আহযাব ৫৩, তাফসীরে মাযহারী ৭/৩৮৪, মেশকাত ১/২৭০, জাওয়াহেরুল ফিকহ ৪/১৪৫)

প্রসঙ্গ : ইমামের পেছনে ইকতিদা

রবিউল ইসলাম

ধামরাই, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

কোনো মসজিদের ইমাম সাহেব যদি গার্লস স্কুলের শিক্ষক হয় তবে কি তার পিছনে নামাযের ইকতিদা জায়েয হবে?

সমাধান :

পর্দা ইসলামের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিধান। তা অমান্য করার কোনো অবকাশ নেই। পর্দা লঙ্ঘণকারী শরীয়তের দৃষ্টিতে ফাসেক। আর ফাসেকের পিছনে নামায আদায়, তাকে ইমাম বানানো নাজায়েয। প্রশ্নে বর্ণিত উক্ত ইমাম সাহেব গার্লস স্কুলের শিক্ষকতা করতে গিয়ে যদি সাবালিকা মেয়েদের পাঠদান করে তাহলে তার পেছনে নামায আদায় করা ও তাকে ইমাম বানানো জায়েয হবে না। (রাদ্দুল মুহতার ১/৫৬০, বাদায়েউস সানায়ে ১/৬৬৮, আহসানুল ফাতাওয়া ৩/৩২০)

প্রসঙ্গ : মসজিদের মেহরাব

আব্দুল কাদের ইউসুফী

যোকসা কওমী মাদরাসা, জানিপুর যোকসা, কুষ্টিয়া।

জিজ্ঞাসা :

মসজিদের সামনে ইমামের দাঁড়ানোর মেহরাব কখন থেকে কিভাবে চালু হয়? কা'বা ঘরে তো আমাদের দেশের মত বর্ধিত মেহরাব নেই।

সমাধান :

সর্বপ্রথম উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহ.) ৯১ হি: মসজিদে নববীতে মেহরাব তৈরী করেন। যা ইতিপূর্বে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবাদের জামানায় ছিল না। মূলত ইমামের দাঁড়ানোর স্থান নির্ণয় করার জন্য মেহরাব তৈরীর প্রথাটি চালু হয়। এতে শরীয়তের দৃষ্টিতে আপত্তিকর কিছু নেই। আর বাইতুল্লাহর ভিতরে যেহেতু ফরজ নামায জামাআতের সহিত পড়া হয় না, তাই এমন স্থাপনা তৈরীর প্রয়োজন পড়ে না। (মাওসূআতুল ফিকহিয়্যা৩৬/১৯৫, রাদ্দুল মুহতার ১/৬৪৫, উমদাতুল ফিকহ ২/২৭৩)

প্রসঙ্গ : মাহরাম

আব্দুল কাদির ইউসুফী

খোকসা কওমী মাদরাসা

জানিপুর, কুষ্টিয়া।

জিজ্ঞাসা :

একজন মহিলার দুই বিয়ে হয়। প্রথম স্বামীর ছেলে ২য় স্বামীর বোনদের সাথে অর্থাৎ বৈপিতৃক ফুফুর সাথে দেখা করতে পারবে কি না? তদ্রুপ বৈমাতৃক খালা অর্থাৎ বাপ দুই বিয়ে করলে ওই দ্বিতীয় মা'র বোনদের সাথে দেখা করা যাবে কি না?

সমাধান :

শরীয়তের বিধান অনুযায়ী কোনো মহিলার প্রথম স্বামীর ছেলের জন্য দ্বিতীয় স্বামীর বোন, তদ্রুপ কোনো পুরুষের জন্য তার সৎমায়ের বোন মুহাররামাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। বিধায় তাদের সাথে পর্দাহীনভাবে দেখা সাক্ষাৎ জায়েয হবে না। (সূরায়ে নিসা ২৩, মাআরিফুল কুরআন ২/৩৬১, ফাতাওয়ায়ে হক্কানিয়া ৪/৩৩০)

প্রসঙ্গ : ওরশ মাহফিল

সিদ্দিকুর রহমান

সদর নোয়াখালী।

জিজ্ঞাসা :

আমি কয়েকটি প্রশ্নের সমাধান পেতে ইচ্ছুক।

১. ইসলামের দৃষ্টিতে ওরশ মাহফিল পালন করার বিধান কি?

২. যে সকল ব্যক্তি ওরশ মাহফিলের আয়োজন করে তাদেরকে ইসলামের দৃষ্টিতে কি বলা হবে ও তাদের সাথে

কেমন আচরণ করা উচিৎ?

৩. ওরশের যে সকল প্রাণী মান্নত বা হাদিয়া আসে সেসকল প্রাণী ও গোশতের হুকুম কি? এবং যে সকল মানুষ টাকা অথবা গরু ছাগল দিয়ে অংশ গ্রহণ করে এবং যেসকল মানুষ অনুষ্ঠান দেখার জন্য যায় তাদের হুকুম কি?

৪. কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করে তার উপর ফুল দেওয়া এবং মোম ও আগর বাতি জালানোর হুকুম কি?

৫. কবরকে সালাম করা ও চুমু খাওয়ার বিধান কি? এবং তাতে কুরআন খানী করা কেমন?

সমাধান :

১. বর্তমানে প্রচলিত ওরশ মাহফিল শরীয়ত সমর্থিত নয়। (মিশকাত শরীফ ১/৮৬, মেরকাত ৩/১০, তাফসীরে মাযহারী ২/৬৫, কেফায়াতুল মুফতী ১/২০৪)

২. যে সকল ব্যক্তি ওরশ মাহফিলের আয়োজন করে তাদেরকে ইসলাম বিরোধী কাজে লিপ্ত বলা হবে। প্রথমত তাদেরকে কৌশলে বুঝিয়ে সঠিক পথে আনার চেষ্টা করবে, যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে তার সাথে আন্তরিকতা ও খোলামেলা সম্পর্ক রাখা যাবে না। কেননা বেদআতী ও ফাসেক ব্যক্তির সাথে খোলামেলা সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব রাখা না জায়েয। (বায়হাকী ৬১, হাদীস নং ৯৪৬৪, ফাতাওয়া রহীমিয়া ২/৩৭২)

৩.ওরশে আগত মান্নত বা হাদিয়া যদি মাযারের অলি বা বুযুর্গের সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয় তাহলে তা সম্পূর্ণ নাজায়েয ও হারাম। আর সে সকল প্রাণীর গোশতও হারাম। আর যে সমস্ত লোক ওরশে টাকা অথবা গরু ছাগল দ্বারা অংশ গ্রহণ করে তারাও শরীয়ত বিরোধী কাজে লিপ্ত। শুধু মাত্র অনুষ্ঠান দেখার জন্য ওরশে যাওয়াও না জায়েয। (মেশকাত শরীফ ৩৫৭, দুররে মুখতার ২/৪৩৯, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ১/২১৪)

৪. কবরে দাফনকৃত ব্যক্তির সম্মানে তাকে সেজদা করার উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করা সম্পূর্ণ হারাম ও শিরকী কাজ। কবরে ফুল দেওয়া এবং মোম ও আগরবাতি জ্বালানো নাজায়েয ও বেদআত। (মিশকাত শরীফ ১/৭১, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া ১/১৬৬, ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া ১/২০৯)

৫. কবরে দাফনকৃত ব্যক্তিকে যেয়ারত করার সময় হাদিসে বর্ণিত নির্দিষ্ট নিয়মে সালাম দেওয়া ও তার জন্য দু'আ করা সুন্নাত। তবে মৃত ব্যক্তির সম্মানে প্রচলিত ভঙ্গিমায় মাথা ঝুঁকিয়ে সালাম দেওয়া না জায়েয ও বিদ'আত। অনুরূপ কবরকে চুমু খাওয়া না জায়েয ও বিদআত। এবং ঈসালে ছওয়াবের উদ্দেশ্যে কুরআন খানী করা জায়েয। তবে প্রথাগতভাবে বিনিময় দিয়ে কুরআন খানী করা না জায়েয। (রাদ্দুল মুহতার ২/২৪২, আহসানুল ফাতাওয়া ১/৩৬, ৪/১৮৬)

প্রসঙ্গ : তারাবীহর নামায

আবুল খায়ের
আদিত্যবাড়ী, রায়গঞ্জ
সিরাজ গঞ্জ।

জিজ্ঞাসা :

খতম তারাবীহ চলাকালীন কারেন্ট চলে যাওয়ায় অথবা অন্য কোনো কারণে যদি মাইক বা সাউন্ড বক্সের আওয়াজ বন্ধ হয়ে যায় যার কারণে দ্বিতীয় তলার মুসল্লী অথবা ইমাম থেকে দূরবর্তী অধিকাংশ বা কিছু মুসল্লি তিলাওয়াত একেবারেই শুনতে না পায়। (কখনও পাঁচ, সাত আয়াত কখনও অর্ধ পৃষ্ঠা কখনও এক রাকাতের পুরো তিলাওয়াত) এমতাবস্থায় তাদের খতম পরিপূর্ণ হবে কি না? না হলে ইমাম সাহেবকে কি আবার পূণরাবৃত্তি করার জন্য আবেদন করতে হবে কি না? অনুরূপ নামাযে তন্দ্রা আসার কারণে যদি কিছু তিলাওয়াত শুনতে না পায় তাহলে তার খতম পূর্ণ হবে কি না? না হলে করণীয় কি?

২. ইমামের কিরাত মুকতাদীর কিরাত হওয়ার জন্য শুনা জরুরী না হলে তারাবীহর মধ্যে ইমামের খতম মুক্তাদির শুনার জরুরী হবে কেন? ইকতিদা অবস্থায় তিলাওয়াত কোনো কারণে না শুনতে পেলেও তা তো খতম পূর্ণ হওয়ার কথা।

সমাধান :

খতম তারাবীহ চলাকালীন বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার কারণে সাউন্ড বক্স বন্ধ থাকায় বা তন্দ্রা আসার কারণে কেউ তেলাওয়াতের কোনো অংশ শুনতে না পেলেও পরিপূর্ণ খতমের ছওয়াব পেয়ে যাবে। (আ-পকে মাসায়েল আওর উনকা হল ৩/৬৭, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৪/৩১২, নেযামুল ফাতাওয়া ৫/৯৪)

প্রসঙ্গ : মসজিদের ফান্ড

ইমাম বাইতুননুর জামে মসজিদ

জিজ্ঞাসা :

আমাদের মসজিদে রমাজান মাসে ইফতারের জন্য টাকা উঠানো হয়। যথাযথভাবে খরচ করার পরও কিছু টাকা অবশিষ্ট থেকে যায়। সকল দাতাগণের প্রতিনিধি হিসেবে মসজিদ কমিটি অতিরিক্ত টাকাগুলো মসজিদের সাধারণ ফাণ্ডে জমা করে বিভিন্ন প্রয়োজনে খরচ করে থাকে। মসজিদে পড়তে আসা শিশুদের পুরষ্কার বাবতও তা খরচ হয়। দাতাদের পক্ষ থেকেও এ বিষয়ে কোনো আপত্তি নেই। এখন আমাদের জানার বিষয় হলো ইফতার ফণ্ডের অতিরিক্ত টাকা এভাবে ব্যয় করা শরীয়ত সম্মত কি না?

সমাধান :

ইফতার ফাণ্ডের অতিরিক্ত টাকা দাতাগণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুমতিক্রমে মসজিদের সাধারণ ফাণ্ড এবং মসজিদে পড়তে আসা শিশুদের পুরষ্কার বাবত ব্যয় করতে পারবে। (ফতাওয়া রহীমিয়া ৮/২৬৬, জামেউল ফাতাওয়া ২/৫৩৫, এমদাদুল আহকাম

৩/১৮৯)

প্রসঙ্গ : ইমামত

আলহাজ্ব কফিল উদ্দীন সরকার
নর্দ্দা, গুলশান, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

১. যদি কোনো খতীব/ইমাম সাহেব সুন্নাত তরীকায় ইস্তিঞ্জা করাকে ব্যাঙ্গ করে বলেন নাচানাচি বা জাম্পিং এর দরকার কি। হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইস্তিঞ্জা করতে কখনও দাঁড়াননি বা হাটাহাটি করেননি।

২. যদি কোনো খতীব/ইমাম সাহেব নামাযে জোরে আমীন বলা, রফয়ে ইয়াদাইন করা, সূরা ফাতিহা পড়তে বলেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সম্পর্কে বিভিন্ন মত পোষণ করেন। এরূপ খতীব/ইমাম সাহেবের পেছনে নামায আদায় করা যাবে কি না?

সমাধান :

১. হাদীস শরীফে পবিত্রতা অর্জনের লক্ষ্যে পেশাব থেকে বিশেষভাবে বেঁচে থাকার গুরুত্ব বয়ান করা হয়েছে। অন্যথায় কবরে শাস্তি ভোগ করতে হবে। তাই ফুকাহায়ে কিরাম পেশাবের পর পরিপূর্ণ পবিত্রতা অর্জনের জন্য ঢিলাকুলূখসহ যা প্রয়োজন তা করতে বলেছেন। হাঁটা চলাও তার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এ বিষয়ে ব্যাঙ্গ করে কথা বলা মুর্খতার বহিঃপ্রকাশ। যা কোনো ইমাম সাহেবের জন্য আদৌ সমীচীন নয়। (বুখারী শরীফ ১/৩৪, মুসলিম শরীফ ১/১৪১, নাসায়ী শরীফ ১/৬, আবু দাউদ শরীফ ১/৪, তিরমিযী শরীফ ১/২১, দুররুল মুখতার ১/৩৪৪, মাজমাউল আনহুর ১/৬৭)

২. প্রশ্নে বর্ণিত ইমাম সাহেব যদি ইমাম আবু হানীফা (রহ.)কে গালমন্দ না করে এবং তাঁর অনুসারীদেরকে মুশরিক না বলে এবং নামাযের ফরজ ওয়াজিব বিষয়ে হানাফী মাযহাবের প্রতি লক্ষ্য রাখে তাহলে তার পেছনে নামায জায়েয হবে। অন্যথায় তার ইমামত মাকরূহে তাহরীমী তথা না জায়েয। সর্বাবস্থায় এধরনের লোকদেরকে ইমাম বানানো অনুচিত।

যেহেতু হাদীস শরীফে আস্তে আমীন বলা, রফয়ে ইয়াদাইন না করা এবং ইমামের পেছনে সূরায়ে ফাতেহা না পড়ার কথা বলা হয়েছে তাই এর বিপরীত করতে বলা মুর্খতার পরিচায়ক। (বাহরুর রায়েক ১/৬১৩, আহসানুল ফাতাওয়া ১/২৮২, ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া ২/৭১)

প্রসঙ্গ : পদচুম্বন

মুহাম্মদ আব্দুর রউফ
ছাত্র, মার্কেটিং বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

ইসলামে পদচুম্বনের হুকুম কি? এটাকি শিরিক বিদ'আত নাকি সুন্নাত। এক দল আলেম বেশ জোরালোভাবে একে সুন্নাত বলছেন। এটা সুন্নাত হওয়ার পেছনে তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বিভিন্ন প্রসিদ্ধ কিতাব থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছেন। এর মধ্যে রয়েছে সুনানে আবুদাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী শরীফ, ইবনে কাসীর ইত্যাদি। এছাড়া ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর আদাবুল মুফরাদ কিতাবে পদচুম্বনের ওপর আলাদা একটি অধ্যায় আনেন। এই বিষয়ের যে হাদীসগুলো রয়েছে তার কয়েকটাকে কোনো কোনো বিখ্যাত মুহাদ্দিস সহীহ, কেউ কেউ হাসান বলেছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন, তাবরানী (রহ.), ইবনে হাজার আসকলানী (রহ.)। এখানে আরো উল্লেখ্য যে, এ বিষয়ের ওপর হাদীসগুলোর মূল কথা হলো, মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোনো এক বেদুইনের পদচুম্বন গ্রহণ করেছেন, সেখানে উপস্থিত সাহাবীগণ কোনো আপত্তি করেন নি। আবার কোথাও মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজে কোনো একজন ব্যক্তিকে পদচুম্বনের অনুমতি দিয়েছেন, আবার কোথাও কোনো এক ব্যক্তিকে তার মায়ের পদচুম্বন করতে আদেশ করছেন, কোনো হাদীসে হযরত আলী (রা.) হযরত আব্বাস (রা.) এর পদচুম্বন করছেন। এছাড়াও কোনো এক ঘটনায় দেখা যাচ্ছে, ইমাম মুসলিম (রহ.) ইমাম বুখারী (রহ.) এর পদচুম্বনের অনুমতি চেয়েছেন। আবার কোথাও ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর উস্তাদের পদচুম্বনের অনুমতি চেয়েছেন। এরকম বহু হাদীস ও ঘটনার উদ্ধৃতি সমৃদ্ধ একটি রেফারেন্স সিট আমার হাতে এসেছে। যা মুহতারামের নিকট পত্রের সাথে পেশ করলাম। এ ব্যাপারে রেফারেন্সগুলোর গ্রহণযোগ্যতা বিশ্লেষণ করে মুহতারামের নিকট সুনির্দিষ্ট মন্তব্য অথবা এ ব্যাপারে ইসলামের রায় কি তা জানতে আগ্রহী।

সমাধান :

হাদীস শরীফে বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের প্রকৃত পদ্ধতি হলো তাঁদের আদেশ মান্য করা। এতদ সত্ত্বেও তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও মহব্বতের বহিঃ প্রকাশের জন্য (সেজদার সাদৃশ্য না হলে) সরাসরি পদচুম্বন অথবা হাত দিয়ে পা স্পর্শ করার অনুমতি আছে। তবে সাধারণ লোকেরা এ পার্থক্য বুঝতে পারে না বিধায় তাদেরকে এ কাজ থেকে বারণ করা উচিৎ। (আল-আদবুল মুফরাদ ৩/২৮৯, মুসতাদরাক ৪/১৯০, আল মুহীতুল বুরহানী ৬/১৪৯, এমদাদুল আহকাম ৪/৪০০)

প্রসঙ্গ : লিসানী এতেকাফ

আব্দুল কাদের ইউসুফী
খোকসা কওমী মাদরাসা
জানিপুর ৭০২০ খোকসা
কুষ্টিয়া।

জিজ্ঞাসা :

কোনো কোনো হক্কানী পীর তার

মুরীদকে ইসলাহ করার জন্য লিসানী এ'তেকাফ বলে কথা বলা বন্ধ করে রাখেন। ইশারা ইঙ্গিতে কথা বলেন। এ ধরনের পদ্ধতিতে ইসলাহ শরীয়ত সম্মত কি না?

সমাধান :

শরীয়তে যবানের হেফাযত এবং অহেতুক কথাবার্তা থেকে চুপ থাকার অনেক ফজীলত বর্ণিত আছে। তাই কোনো পীর সাহেব চিকিৎসা স্বরূপ নিজ মুরীদের এসলাহের জন্য প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতি অবলম্বন করলে তা না জায়েয বলা যাবে না। (জামে তিরমিযী ২/৭৬, , ২/৬৬, ফাতাওয়ায়ে হক্কানিয়া ২/২৭৪)

প্রসঙ্গ :মাদরাসার ফাণ্ড থেকে মরহুম সভাপতির পরিবারের জন্য অনুদান দেওয়া

মুহাম্মদ ওবাইদুল্লাহ
ত্রিশাল, মোমেনশাহী।

জিজ্ঞাসা :

এক মাদরাসার মজলিসে শূরার সভাপতি ইন্তিকাল করেছেন। তাঁর স্ত্রী ও ছেলে মেয়ে রয়েছে। এমতাবস্থায় মাদরাসার মুহতামিম সাহেব মাদরাসার ফাণ্ড থেকে মরহুম সভাপতির পরিবারের জন্য এককালীন অনুদানের ব্যবস্থা করতে পারবে কি না?

সমাধান :

মাদরাসা ফান্ডে জমাকৃত অর্থ/চাঁদা ওয়াকফের মালের হুকুমে যা চাঁদা দাতাদের অনুমতি ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী খরচ করা জরুরী। দাতাগণ সাধারণত মাদরাসার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের জন্য চাঁদা দিয়ে থাকেন। বিধায় মাদরাসার সভাপতির পরিবারের জন্য মাদরাসার ফাণ্ড হতে এককালীন অনুদান দেওয়া মুহতামিম সাহেবের জন্য শরীয়তের আলোকে বৈধ হবে না। (রাদ্দুল মুহতার ৪/৪৩৫, ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া ১৬/১২১)

প্রসঙ্গ : রেহেন

মুহাম্মদ আব্দুর রউফ
ফরীদপুর।

জিজ্ঞাসা :

কোনো ব্যক্তি কারো থেকে কোনো জিনিস বাকিতে ক্রয় করল। আর বিক্রেতা ক্রেতার কাছ থেকে পণ্যের সমমূল্য কোনো জিনিস রেখে দিল। এখন আমার প্রশ্ন হলো যে বিক্রেতা বন্ধকী বস্তুকে ব্যবহার করতে পারবে কি না? আর যদি ব্যবহার করতে না পারে তাহলে বিক্রেতার ক্ষতি থেকে বাঁচার উপায় কি? জানালে কৃতজ্ঞ হবো।

সমাধান :

বন্ধক গ্রহীতার জন্য বন্ধক হিসাবে রক্ষিত জিনিস থেকে ফায়দা অর্জন করা জায়েয নেই। বিধায় প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে বিক্রেতার জন্য তা ব্যবহার করা জায়েয হবে না। আর যদি বন্ধক দাতা সময় মত টাকা পরিশোধ না করে তাহলে বন্ধক গ্রহীতা তার অনুমতি নিয়ে তা বিক্রি করে নিজের হককে উসূল করে নিবে। আর যদি সে অনুমতি না দেয় তাহলে প্রশাসনের আশ্রয় নিয়ে তার হক্ব উসূল করে নিতে পারবে। (আদদুররুফ মুখতার ৬/৪৮২, হেদায়া ৪/৫২২, ফতাওয়ায়ে উসমানী ৩/৪২২)

চশমার জগতে যুগ যুগ ধরে বিখ্যাত ও বিশ্বস্ত

মেহবুব অপ্টিক্যাল কো.

এখানে অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে চক্ষু পরীক্ষা করা হয়।
পাইকারী ও খুচরা দেশী বিদেশী চশমা সুলভ মূল্যে বিক্রি করা হয়।

১২ পাটুয়াটুলি রোড, ঢাকা ১১০০
ফোন : ০২- ৭১১৫৩৮০ , ০২- ৭১১৯৯১১

১৩ গ্রীন সুপার মার্কেট, গ্রীন রোড, ঢাকা, ১২১৫
ফোন : ০২-৯১১৩৮৫১

নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যেভাবে নামায পড়তে বলেছেন-১

মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ রুকন নামায। ঈমানের পরেই যার স্থান। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর যুগ থেকে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তবে তাবেঈন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন, মুহাদ্দিসীনসহ বর্তমান যুগপর্যন্ত মুসলমানগণ একই পদ্ধতিতে নামায আদায় করে আসছেন। যা স্বয়ং নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর বাতলানো পদ্ধতি। নামাযের কয়েকটি সুন্নাত, মুস্তাহাব ও উত্তম অনুত্তম বিষয় নিয়ে ইমামগণের মধ্যে সামান্য ভিন্নমত দেখা যায়। এটি না বিতর্ক, না বিবাদ না অন্য কিছু। মুজতাহিদগণের সামান্য ইজতিহাদী রায় ভিন্নতা। বরং যে মুসলমান যে ইমামকে অনুসরণ করেন উক্ত বিষয়সমূহে সেই ইমামের মতানুসারেই তাঁরা আমল করে থাকেন।

সম্প্রতি একটি বিশেষ মহল সেরূপ কিছু সুন্নাত, মুস্তাহাব এবং উত্তম অনুত্তম বিষয়ে তিলকে তাল বানিয়ে মুসলিম উম্মাহের মধ্যে বিতর্ক, তা থেকে বিবাদ এবং এরপর ফ্যাসাদ সৃষ্টির প্রয়াস পাচ্ছে। এমনকি এই মহলটি নবীযুগ থেকে এই পর্যন্ত চলে আসা নামাযের পদ্ধতিটির কোনো দালিলিক ভিত্তি নেই বলেও অনেক ক্ষেত্রে অপপ্রচার চালায়। (নাউজু বিল্লাহ)

নামাযসহ ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মহলটির মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডা ও অহেতুক অপপ্রচার পরিকল্পিত ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ইসলামের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ রুকন-স্তম্ভ নামাযকে যদি একটি বিতর্কিত বিষয় হিসেবে প্রতিপন্ন করা হয় তবে ইসলামে আর থাকেই বা কি? আর সেরূপ প্রতিপন্ন করে ইসলামের অসারতা প্রমাণ করাই হয়তো বিধর্মীদের পরিকল্পনার একটি অংশ।

কিন্তু নামাযসহ ইসলামের বিভিন্ন দিক নিয়ে এরূপ বিতর্ক সৃষ্টি করার মধ্যে মহলটির উদ্দেশ্যইবা কি বুঝাই মুশকিল। যেসকল বিষয়ে এরা ব্যাপকভাবে অপপ্রচার চালাচ্ছে সেসব বিষয়তো যুগের বিখ্যাত আলেম উলামাদের সান্নিধ্যে এসে সমাধান করতে চাইলে বা জানতে চাইলে কয়েক দিনেই সমাধান হয়ে যায়। কিন্তু মহল বিশেষটি তা না করে বরং মিডিয়াতে বসে একদিকে ধর্মীয় এসকল বিধানাবলী নিয়ে বিতর্ক ও মতানৈক্য প্রচার করে থাকে এবং ইসলামের কর্ণধার সাহাবায়ে কেরাম, ইমাম মুজতাহিদ, মুহাদ্দিস ও ফকীহদের বিরুদ্ধে হরেক রকম প্রোপাগাণ্ডা চালাতে থাকে। তাথেকে সহজে প্রতীয়মান হয় এসকল প্রোপাগাণ্ডা ও অপপ্রচারের কোনো সৎ উদ্দেশ্য থাকতে পারে না।

ইসলামের প্রথম যুগ থেকে চলে আসা নামাযের অমোঘ ও সঠিক পদ্ধতির কোনো দালিলিক ভিত্তি নেই এমন ডাহা মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডার অসারতা প্রমাণে ওলামায়ে কেরাম বড় বড় কিতাবাদী রচনা করেছেন। যেগুলো থেকে নির্বিশেষে মুসলমানগণ উপকৃত হয়েছেন এবং হচ্ছেন। আমরা এখানে নাতিদীর্ঘ আবার অতি সংক্ষিপ্তও নয় এমনভাবে নামাযের প্রতিটি বিষয় দলিল ভিত্তিক আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

নামাযের সময়সমূহ

ফজরের সময় :

১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন–

وقت صلوة الصبح مالم تطلع الشمس

ফজরের নামাযের সময় হলো সুবহে সাদেক থেকে সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত। (সহীহে মুসলিম ১/২২৩)

২. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন–

ان للصلوة اولا وآخرا۔۔۔ وان اول وقت الفجر حين يطلع الفجر وان آخر وقتها حين تطلع الشمس۔

"নিশ্চয়ই নামাযের সময়ের শুরু এবং শেষ আছে। ফজর নামাযের সময় শুরু হয় ফজর (সুবহে সাদেক) উদয় থেকে এবং এর শেষ সময় হলো সূর্যোদয়ের আগমুহূর্ত পর্যন্ত। (জামেয়ে তিরমিযী ১/৩৯,৪০, মুসনাদে আহমদ৭/২৮, হাদীস নং ৭১৭২)

জুহরের সময় :

১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন–

وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله مالم تحضر العصر

"জুহর নামাযের সময় হলো যখন সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়বে এবং মানুষের ছায়া তার শরীরের বরাবর হবে (এবং ওই সময় শেষ হয়) যতক্ষণ পর্যন্ত আসরের সময় হয়ে না যায়।" (সহীহে মুসলিম ১/২২৩)

২. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাফে যিনি হযরত উম্মে সালমার কৃতদাস, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে নামাযের সময় সম্পর্কে জানতে চাইলে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন–

انا اخبرك صل الظهر اذا كان ظلك مثلك والعصر اذا كان ظلك مثليك

"আমি তোমাকে সে ব্যাপারে বলব, জুহর নামায ঐসময় পড় যখন তোমার ছায়া তোমার সম পরিমাণ হয় এবং আসরের নামায ওই সময় আদায় কর যখন তোমার ছায়া তোমার দেহের দ্বিগুণ পরিমাণ হয়।" (মুওয়াত্তা ইমাম মালেক (রহ.) পৃ: ৫-৬)

এই হাদীসসমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, সূর্য ঢলার পর থেকে জুহর নামাযের সময় আরম্ভ হয় এবং এর ওয়াক্তের শেষ হলো যখন যে কোনো বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুণ পরিমাণ হয় তথা আসরের সময়ের আগ পর্যন্ত।

আসরের সময় :

জুহরের সময় শেষ হতেই আসর নামাযের সময় আরম্ভ হয় এবং সূর্যাস্ত পর্যন্ত বাকী থাকে।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন–

من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر

"যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের এক রাকআত পেল সে আসর পেল।" (সহীহে বুখারী ১/৮২, সহীহে মুসলিম১/২২১)

মাগরিবের সময় :

১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন–

صلوة المغرب مالم يغب الشفق

"মাগরিব নামাযের সময় হলো শফক প্রচ্ছন্ন না হওয়া পর্যন্ত।" (সহীহে মুসলিম ১/২২৩)

২. হযরত সালামা ইবনে আকওয়া হতে বর্ণিত–

ان رسول الله ﷺ كان يصلى المغرب اذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাগরিব নামায আদায় করতেন যখন সূর্যাস্ত হয়ে যেতো এবং পর্দার আড়ালে চলে যেতো।" (সহীহে মুসলিম ১/২২৮, সহীহে বুখারী ১/৭৯)

৩. হযরত জাবের (রা.) একটি দীর্ঘ হাদীসে বর্ণনা করেন–

ثم اذن للعشاء حين يذهب بياض النهار وهو الشفق

"অত:পর এশার আযান বলবে যখন দিনের শুভ্রতা চলে যায়, সেটাই হলো শফক।" (আল মু'জামুল আওসাত লিত্তাবরানী ৫/১২২ হাদীস নং ৬৭৮৭, মাজমাউযযাওয়ায়েদ লিল হায়সামী ২/৪২ হাদীস নং ১৬৮৬)

৪. হযরত আবু মাসউদ (রা.) এর মরফূ হাদীস যেখানে হযরত জিবরাঈল (আ.) এর নামায পড়ানোর কথা উল্লেখ আছে, তাতে আছে–

ويصلى المغرب حين تسقط الشمس ويصلى العشاء حين يسود الافق

"মাগরিবের নামায ওই সময় আদায় করতেন যখন সূর্যাস্ত হয়ে যেত এবং এশার নামায আদায় করতেন যখন পশ্চিমাকাশ কালো হতো।" (আবু দাউদ ১/৬৩, সহীহে ইবনে হিব্বান ৪৯২, হাদীস নং ১৪৯৪)

উল্লেখিত হাদীসমূহ থেকে বুঝা গেল মাগরিবের সময় সূর্যাস্ত থেকে আরম্ভ হয় এবং শফকে আবয়াজ তথা শুভ্রতা কেটে গেলে শেষ হয়।

এশার সময় :

এশার সময় হলো শফক অস্তমিত হওয়ার পর থকে ফজর (সুবহে সাদেক) পর্যন্ত।

১. ইমামতে জিবরাঈলের হাদীসে আছে–

وصلى بى العشاء حين غاب الشفق

"হযরত জিবরাঈল আমাকে এশার নামায পড়িয়েছেন যখন শফক গায়েব হয়ে গিয়েছিল।" (আবু দাউদ ১/৬২)

২. হযরত উবায়দা ইবনে জুরাইয হতে বর্ণিত–

انه قال لابى هريرةؓ ماافراط صلوة العشاء ؟ قال طلوع الفجر

"তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে জিজ্ঞেস করলেন এশার শেষ সময় কখন? বললেন ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত।" (তাহাবী ১/১১৮)

নামাযের মুস্তাহাব সময় সমূহ

ফজরের মুস্তাহাব সময় :

১. হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (রা.) হতে বর্ণিত–

قال سمعت رسول الله ﷺ يقول اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر

"তিনি বলেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে ইরশাদ করতে শুনেছি যে, ফজর নামায খুব আলোকিত সময়ে আদায় কর। কারণ এর প্রতিদান খুব বেশি।" (জামেয়ে তিরমিযী ১/৪০, সুনানে আবীদাউদ ১/৬৭, সুনানে নাসায়ী ১/৯৪)

হযরত জামালুদ্দীন মুহাম্মদ আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ যায়লায়ী (রহ.) বলেন, অনুরূপ বিষয়ের হাদীস হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (রা.), হযরত বেলাল (রা.) হযরত আনাস(রা.) হযরত কাতাদা ইবনে নূ'মান (রা.) হযরত ইবনে মসউদ (রা.), হযরত আবু হুরায়রা (রা.) প্রমূখ থেকেও বর্ণিত আছে। (নাসবুররায়া লিয যায়লায়ী ১/৩০৪)

২. হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন–

قال رسول الله ﷺ لبلال اسفر بصلوة الصبح حتى يرى القوم مواقع نبلهم

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত বেলাল (রা.) কে বললেন, ফজর নামাযকে খুব উজ্জল সময়ে পড়। যেন মানুষ ঔজ্জল্যতায় তীরের নিশানা অবলোকন করতে পারে।" (মুসনাদে আবী দাউদ তায়ালেসী ১/৫১১ হাদীস নং ১০০১, আল মু'জামুল কাবীর লিত্তাবারানী ৩/১৫১ হাদীস নং ৪২৮৮)

জুহর নামাযের মুস্তাহাব সময় :

গরমকালে জুহর নামাযের সুন্নাত ওয়াক্তঃ

১. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন–

ابردوا بالظهر فان شدة الحر من فيح جهنم

"জুহর নামাযকে ঠাণ্ডা করে (রোদের তীব্রতা প্রশমিত হলে) আদায় কর। কারণ গরমের উত্তাপ জাহান্নামের নিশ্বাসের কারণে হয়।" (সহীহে বুখারী ১/৭৭)

২. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন–

اذا اشتد الحر فابردوا بالصلوة فان شدة الحر من فيح جهنم

"যখন গরমের উত্তাপ বৃদ্ধি পাবে তখন নামায ঠাণ্ডা সময়ে আদায় করো, কারণ গরমের উত্তাপ জাহান্নামের শ্বাসের কারণে বৃদ্ধি পায়।" (সহীহে বুখারী ১/৭৭, সুনানে আবীদাউদ ১/৬৪, সহীহে মুসলিম ১/২২৪, সুনানে নাসায়ী ১/৮৭, জামেয়ে তিরমিযী ১/৪০, সুনানে ইবনে মাজাহ ১/৪৯)

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (রহ.) বলেন, এই সংক্রান্ত (জুহরকে ঠাণ্ডা সময়ে পড়ার) হাদীস হযরত আবু সাঈদ (রা.), হযরত আবু যর (রা.), হযরত ইবনে উমর (রা.) হযরত মুগীরা (রা.), হযরত সফওয়ান (রা.), হযরত আবু মূসা (রা.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এবং হযরত আনাস (রা.) প্রমূখ সাহাবী হতেও বর্ণিত আছে। (জামে তিরমিযী ১/৪০)

শীতকালে জুহর নামাযের মুস্তাহাব ওয়াক্ত :

১. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন–

كان رسول الله ﷺ اذا كان الحر ابرد بالصلوة واذا كان البرد عجل

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গরমের মৌসুমে নামায ঠাণ্ডা সময়ে আদায় করতেন এবং শীত কালে তাড়াতাড়ি আদায় করতেন। (সুনানে নাসায়ী ১/৮৭, সহীহে বুখারী ১/১২৪)

আসর নামাযের মুস্তাহাব সময় :

১. হযরত উম্মে সালমা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন–

كان رسول الله ﷺ اشد تعجيلا للظهر منكم وانتم اشد تعجيلا للعصر منه۔

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জুহরের নামায তোমাদের চেয়ে তাড়াতাড়ি আদায় করে নিতেন আর তোমরা আসরের নামায রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর চেয়ে আগে আদায় করে থাক। (জামেয়ে তিরমিযী ১/৪২, মুসনাদে আহমদ ১৮/২৮৬ হাদীস নং ২৬৫২৬)

২. হযরত আলী ইবনে আবী শায়বান (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন–

قدمنا على رسول الله ﷺ المدينة فكان يؤخر العصر مادامت الشمس بيضاء نقية۔

"আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট মদীনা শরীফে আসি, তখন তিনি আসরের নামায দেরী করে আদায় করতেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্য আলোকিত ও পরিষ্কার থাকত। (সুনানে আবী দাউদ ১/৬৫, সুনানে ইবনে মাজাহ ১/৪৬)

৩. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.)হতে বর্ণিত–

ان النبى ﷺ قال ۔۔۔ فاذا صليتم العصر فانه وقت الى ان تصفر الشمس ۔

"নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম) ইরশাদ করেন, তোমরা যখন আসরের নামায আদায় করবে, তাহলে জেনে রাখো, এর সময় সূর্য হলদে বর্ণ ধারণ করা পর্যন্ত থাকে। (সহীহে মুসলিম ১/২২২)

উল্লেখিত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় আসর নামায দেরী করে পড়া সুন্নাত, তবে এত দেরীও যেন না হয় যে, সূর্য হলদে বর্ণ ধারণ করে।

মাগরিব নামাযের মুস্তহাব ওয়াক্ত :

মাগরিব নামায সূর্যাস্তের পরপরই অনতি বিলম্বে আদায় করা মুস্তাহাব।

১. হযরত সালমা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন–

كنا نصلى مع النبى ﷺ المغرب اذا تورات بالحجاب۔

"আমরা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে সূর্যাস্তের পরপরই মাগরিব নামায আদায় করে নিতাম। (সহীহে বুখারী ১/৭৯)

২. হযরত আবু আইয়ূব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন–

لاتزال امتى بخير او قال على الفطرة مالم يؤخروا المغرب الى ان تشتبك النجوم۔

"আমার উম্মত কল্যাণের উপর থাকবে বা বলেছেন ফিতরাতের উপর থাকবে, যে পর্যন্ত তারা মাগরিবের নামায তারকা উদিত হওয়া পর্যন্ত বিলম্বিত করবে না। (সুনানে আবী দাউদ ১/৬৬, সুনানে ইবনে মাজাহ ১/৫০)

এশার নামাযের মুস্তাহাব সময় :

এশার নামাযকে রাতের এক তৃতীয়াংশ সময় দেরী করে পড়া মুস্তাহাব।

১. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন–

قال رسول الله ﷺ لولا ان اشق على امتى لامرتهم ان يؤخروا العشاء الى ثلث الليل او نصفه۔

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন, যদি আমার উম্মতের কষ্টের ভয় না করতাম তবে তাদেরকে এশার নামায রাত্রের এক তৃতীয়াংশ বা মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত দেরী করার নির্দেশ দিতাম। (জামেয়ে তিরমিযী ১/৪২)

২. হযরত আবু বারযা (রা.) এর বর্ণনায় আছে–

ولا يبالى بتاخير العشاء الى ثلث الليل ثم قال الى شطر الليل۔

"এশার নামাযকে রাতের একতৃতীয়াংশ সময় পর্যন্ত বিলম্ব করাতে কোনো ক্ষতি নেই। এর পর বলেছেন অর্ধেক রাত পর্যন্ত। (সহীহে বুখারী ১/৭৭)

নামাযের নিষিদ্ধ সময়সমূহ :

ফজর ও আসর নামাযের পর নামায আদায় নিষিদ্ধ।

১. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলতে শুনেছি–

لاصلوة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلوة بعد العصر حتى تغيب الشمس۔

"ফজরের নামাযের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত কোনো নামায নেই এবং আসর নামাযের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোনো নামায নেই। (সহীহে বুখারী ১/৮২,৮৩, সহীহে মুসলিম ১/২৭৫)

একই বিষয়ের হাদীস হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এবং হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতেও বর্ণিত আছে। (সহীহে বুখারী ১/৮২, সহীহে মুসলিম ১/২৭৫, জামেয়ে তিরমিযী ১/৪৫)

২. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন–

من لم يصل ركعتى الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس۔

"যে ব্যক্তি ফজরের দু রাকা'আত সুন্নাতে মুআক্কাদা পড়েনি তবে সে যেন উক্ত নামায সূর্যোদয়ের পর আদায় করে নেয়। (জামে তিরমিযী ১/৯৬)

সুবহে সাদিকের পর :

সুবহে সাদিকের পর ফজরের দু রাকা'আত সুন্নাত ব্যতীত অন্য কোনো নফল নামায পড়া মাকরূহ।

হযরত ইবনে উমর (রা.) উম্মুল মূমিনীন হযরত হাফসা (রা.) এর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন–

كان رسول الله اذا طلع الفجر لا يصلى الا ركعتين خفيفتين۔

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুবহে সাদিকের পর হালকা পাতলা শুধু দু রাকাআত নামায ছাড়া আর কোনো নামায আদায় করতেন না। (সহীহে মুসলিম ১/২৫০, সহীহে বুখারী ১/১৫৭, জামেয়ে তিরমিযী ১/৯৬)

সূর্যাস্তের পর :

সূর্যাস্তের পর মাগরিবের ফরজ নামাযের পূর্বে নফল পড়া নিষিদ্ধ।

১. হযরত তাউস (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হতে মাগরীবের ফরজ নামাযের পূর্বে দু' রাকা'আত নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন–

سمعت النبى ﷺ يقول اذا دخل احدكم المسجد والامام على المنبر فلا صلوة ولا كلام حتى يفرغ الامام۔

"আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে বলতে শুনেছি, যখন তোমরা কোনো মসজিদে প্রবেশ কর এবং তখন ইমাম মিম্বারে থাকে তবে তখন না কোন নামাযের অনুমতি আছে, না কথাবার্তার অনুমতি আছে, যতক্ষণ না ইমাম ফারেগ হয়ে না যায়। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ লিল হায়সামী ২/৪০৭ হাদীস নং ৩১২০, জামেউল আহাদীস লিসসুয়ূতী ৩/১১৪ হাদীস নং ১৮৭৯)

সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত এবং যাওয়াল :

হযরত উকবা ইবনে আমের আলজুহনী (রা.) বলেন–

ثلث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا ان نصلى فيهن او ان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب۔

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে তিনটি সময়ে নামায আদায় এবং মৃতকে দাফন করা থেকে নিষেধ করেছেন। (সময়গুলো হলো)

১. যখন সূর্য উদয়ের পথে যতক্ষণ না তা উদয় হয়ে যায়।

২. সূর্য স্থির অবস্থায় যতক্ষণ না সূর্য ঢলে পড়ে।

৩. সূর্যাস্তের কাছাকাছি সময় যতক্ষণ না তা অদৃশ্য হয়ে যায়। (সহীহে মুসলিম ১/২৭৬, জামেয়ে তিরমিযী ২০০, আলজামউ বাইনাস সহীহাইন লিলহুমায়দী ৩/৩৫১ হাদীস নং ২৯৯৩)

قال النبى ﷺ لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر مااستطاع من طهر ويدهن من دهنه او يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلى ماكتب له ثم ينصت اذا تكلم الامام الا غفر له مابينه وبين الجمعة الاخرى

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি জুমআর দিন গোসল করবে এবং সাধ্যানুযায়ী পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অর্জন করে, তৈল অথবা ঘরে সহজলভ্য খুশবো ব্যবহার করে তারপর জুমুআর জন্য বের হয় (সেখানে গিয়ে) দুই এর মধ্যে পার্থক্যসৃষ্টি না করে এবং নির্ধারিত নামায আদায় করে এবং যখন ইমাম খুতবা দেয় তখন নিরবতা গ্রহণ করে– এরূপ লোকের উক্ত জুমুআ থেকে তার পরের জুমুআ পর্যন্ত সকল গোনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। (সহীহে বুখারী ১/১২১, ১২৪)

২. হযরত নুবাইশা আল হুযালী (রা.) এর সূত্রে বর্ণিত, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)ইরশাদ করেন–

فان لم يجد الامام خرج صلى مابداله وان وجد الامام قد خرج جلس فاستمع وانصت حتى يقضى الامام جمعته وكلامه

"যদি ইমাম সাহেব খুতবার জন্য বের না হয় তবে যা প্রযোজ্য নামায আদায় করে নাও আর যদি ইমাম খুতবার জন্য বের হয়ে পড়ে তবে বসে যাও এবং মনোনিবেশ চিত্তে খুতবা শ্রবন করো এবং খামুশ থাক যতক্ষণ পর্যন্ত ইমাম নামায শেষ করে। (মুসনাদে আহমদ ১৫/৩০০ হাদীস নং ২০৫৯৯, গায়াতুল মাকসাদ ফী যাওয়ায়েদিল মাসনাদ লিল হায়সামী ১/১৫৪)

৩. হযরত ইবনে উমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন–

مارايت احدا على عهد رسول الله ﷺ يصليها

"আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে এই দু' রাকা'আত নামায আদায় করতে কাউকে দেখিনি। (সুনানে আবীদাউদ ১/১৮৯, মুসনাদে আব্দ ইবনে হুমাইদ ২৫৬ হাদীস নং ৮০৪)

২. হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন–

طفنا فى نساء رسول الله ﷺ فسألناهن هل رايتن رسول الله ﷺ يصلى هاتين ركعتين قبل المغرب حين يؤذن المؤذن فقلن لا۔

"আমরা উম্মুল মুমিনীনগণের (রা.) খেদমতে হাজির হয়ে জিজ্ঞেস করলাম আপনারা কি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে মাগরিব নামাযের পূর্বে যখন মুআযযিন আযান দেন তখন দু'রাকআত নামায আদায় করতে দেখেছেন? তাঁরা বলেন, না।" (মুসনাদুশ শামেয়ীন লিল ইমামিত্তাবরানী ৩/২১২ হাদীস নং ২১১০)

৩. হযরত মনসূর (রহ.) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন–

ما صلى ابو بكر وعمر وعثمانؓ الركعتين قبل المغرب۔

"হযরত আবু ববকর (রা.), হযরত উমর (রা.) এবং হযরত উসমান (রা.) মাগরিব নামাযের পূর্বে দু' রাকআত আদায় করতেন না।" (কানযুল উম্মাল ৮/২৫ হাদীস নং ২১৮০৯, মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক ২/২৮৯ হাদীস নং ৩৯৯৮)

খুৎবার সময় :

১. হযরত সালমান ফারেসী (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন–

উদীয়মান কাফেলা

দুটি প্রশ্নের সহজ ও সাবলীল উত্তর

এক: রাসুল সা. ও তাঁর সাহাবীগণ কি রাজ্য দখলের আগ্রাসনমুলক যুদ্ধ করেছেন?

উত্তর: পিঠ যখন দেয়ালে ঠেকে যায় অস্তিত্বের প্রশ্নে অস্ত্রধারণ করা তখন অনিবার্য হয়ে পড়ে। আত্মরক্ষার অধিকার একটি স্বীকৃত মানবিক অধিকার। পৃথিবীর সব জুলুম অত্যাচারেরই একটা সীমা আছে, সেই সীমা অতিক্রম করার পরও নিশ্চুপ হয়ে পড়ে থাকা মানবতা ও ভদ্রতা নয়; বরং ভীরুতা ও কাপুরুষতা। আগুনের তাপে শীতল পানি নিজেই শুধু উত্তপ্ত হয় না, বরং আগুনের স্বভাব গ্রহণ করে অন্যকেও ঝলসে দেয়। মুসলমানদের অবস্থাও সেই শীতল পানির ন্যায়। ইসলাম গ্রহণের 'অপরাধে'যে ভয়াবহ জুলুম-নির্যাতন মক্কার মুশরিকদের হাতে তাঁরা ভোগ করেছেন, তার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর অন্য কোনো জাতির, অন্য কোনো ধর্মের ইতিহাসে নেই। তদ্রুপ কুরাইশদের বর্বরতা ও পাশবিকতার মুখে যে অসীম ধৈর্য, ত্যাগ ও কুরবানীর পরিচয় তাঁরা দিয়েছেন, তা ছিল অতুলনীয় । কিন্তু বর্বরতা ও পাশবিকতা যখন সকল সীমা অতিক্রম করে গেল, অপরদিকে আত্মরক্ষার নূন্যতম শক্তি মুসলমানদের অর্জিত হল তখন অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে একান্ত অনন্যোপায় অবস্থায় তাদেরকে অস্ত্রধারণ করতে হয়েছিল। তাই জাতি হিসেবে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করা এবং আল্লাহর দ্বীন তাঁরই যমীনে প্রতিষ্ঠিত রাখাই ছিল তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

অতএব, আল্লাহর রাসুল সা. ও তাঁর সাহাবাগণের নামে রাজ্য দখলে আগ্রাসন মূলক যুদ্ধের অপবাদ আরোপ করা অতি হাস্যকর ও ভিত্তিহীন।

দুই.

দারুল উলুম দেওবন্দ কী ও কেন?

উত্তর: দারুল উলুম দেওবন্দ কোনো দলের নাম নয়। এটি কোনো রাজনৈতিক দলও নয়। এটি এমন কোনো দল বা বাহিনীও নয়, যা হক্ব ও না হক্ব (বাতিল) সর্বক্ষেত্রে একে অপরকে সঙ্গ দেয়ার জন্য প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এটি বাহাছ ও মোনাযারা (তর্ক-বিতর্কের মহড়া)এর এমন কোনো টিমও নয়, যা শুধুমাত্র বিশেষ কোনো ফের্কার প্রতিরক্ষার জন্যে অস্তিত্ব লাভ করেছে, বরং প্রকৃত পক্ষে দারুল উলুম দেওবন্দ কুরআন ও সুন্নাহের সেই তা'বীরের (ব্যাখ্যার) নাম, যা সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীনে এযাম ও আসলাফে উম্মত তথা উম্মতের পূর্বসুরীগণের মাধ্যমে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে। এটি সেই বিশুদ্ধ ইসলামের নাম, যা বুযুর্গানে দ্বীন পেটে পাথর বেঁধে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। এটি চরিত্র ও কীর্তির সেই সৌরভের নাম, যা সাহাবা ও তাবেয়ীনের জীবন চরিত থেকে উৎসারিত হয়েছে। এটি সেই অঙ্গীকার ও সংগ্রামের নাম, যার উর্ধ্ব পরম্পরা বদর ও উহুদের ময়দান পর্যন্ত পৌঁছেছে। এটি সেই ইখলাছ, লিল্যাহিয়্যাত, বিনয়, সরলতা, তাক্বওয়া, ত্বহারাত, সত্য কথন ও নির্ভীকতার নাম, যা ইসলামী ইতিহাসের প্রত্যেক যুগে উলামায়ে হক্বের বিশেষ বৈশিষ্ট ছিল। বিগত শতাব্দীতে দারুল উলুম দেওবন্দের সংস্কার মুলক কীর্তি এই যে, সে মুসলমানদের অধঃপতনের যুগে ইলম ও আমলের গুণাবলীকে প্রান দান করেছে। এবং এমন মানব কাফেলা তৈরী করেছে, যাঁরা সে সব গুণের জীবন্ত ও জাগ্রত প্রতিক । বিধায়, যে ব্যক্তি এসব গুণে গুনান্বিত এবং যার মধ্যে এই পথ রেখায় প্রথমে নিজের অতঃপর পুরা উম্মতের ইসলাহের ফিকির রয়েছে, সেই কেবল দারুল উলুম দেওবন্দের সাথে সম্পৃক্ত; যদিও বাহ্যত সে দারুল উলম দেওবন্দ কে কখনো চোখে দেখেনি।

সংগ্রহে: আরিফুল হক সিদ্দিক

কুরআনুল কারীমের মর্যাদা

মানুষের এ জীবন ক্ষণস্থায়ী পরীক্ষার হল স্বরুপ। যার প্রস্তুতি হিসেবে একমাত্র কুরআনুল কারীমই প্রতি ক্ষেত্রে আমাদের জন্য অনুস্মরণীয় এবং সফলতার চাবি কাঠি। আল্লাহ তা'আলা যে রকম সম্মানিত তাঁর কালামে পাক ও সম্মানিত। তাঁর কালামে পাকের সম্মান কোনো দিকে থেকেই কম নয়। তাই সর্বক্ষেত্রেই এর যথাযথ কদর করা আমাদের সকলেরই দায়িত্ব।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে,ক্ষনস্থায়ী জীবনের সাধারণ বস্তুর যতটুকু মুল্যায়ন বর্তমানে আমরা করে থাকি আল্লাহর কালামের সে পরিমান মুল্যায়ন করিনা। সে কারণে আমাদের উপর একের পর এক অবাল নেমে আসছে। তদুপরি লাঞ্ছিত, বঞ্ছিত ও হিনমন্যতাই যেন

আমাদের সোভা-সৌন্দর্য। অথচ আমরাই ছিলাম একদিন পৃথিবীর ইতিহাসে অদ্বিতীয়। নৈতিকতার কর্ণধার অন্ধকারে আলোর দিশারী। কিন্তু আমরা সেই গৌরব হারিয়ে ফেলেছি। তার কারণ, আমরা আল্লাহর কালামের যথাযথ কদর করতে ভুলে গিয়েছি। যেমন মোবাইল ফোন, লেপটপ, এমনকি টেলিভিশনের রক্ষণাবেক্ষণ ও সৌন্দর্য মন্ডিত করে তুলতে যে রকম অর্থ ও সময় ব্যয় করছি, কুরআনের প্রতি সে পরিমাণ যত্নশীল হইনা। আমরা কতইনা দুর্ভাগা।

মোট কথা হলো, কুরআনুল কারীম আমাদের আখিরাতের পাথেয় এবং সম্বল। সে কুরআনের গিলাফ বুকে জড়িয়ে রাখার পরিবর্তে আমাদের চোখের সামনে তার ছিড়া টুকরা যদি রাস্তায় রেস্তোরায় পড়ে থাকতে দেখে একে সম্মানের সাথে হেফাজত না করি তাহলে রিতিমতই অবমাননা হয়। অনেক সময় তা পায়ে লাগারও আশংকা থাকে। তাই সেরূপ কুরআনের টুকরা দেখা মাত্র তৎক্ষণাত হেফাজত করা আমাদের কর্তব্য। তাই আমরা যথাযথ কুরআনের সম্মান অটুট রাখার চেষ্টা করব। এরূপ কাজ দেখতে ছোট মনে হলেও আল্লাহর কাছে তা হঠাৎ পছন্দ হয়ে গেলে সেটাই আমাদের নাজাতের উসীলা হয়ে যেতে পারে।

রচনায় : মুহাম্মদ রহমতুল্লাহ বিন হাসান

বড়দের পছন্দনীয় বস্তু

* আল্লাহর নিকট তিনটি বস্তু পছন্দনীয়। ১। জিকির কারীর জিহ্বা ২। কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীর অন্তর ৩। ধৈর্য্যশীল আত্মা। (জান্নাত কা-মান জার পৃ:৪৫৬: মা'আরিফে সুলতান খ: ৮ পৃ: ৪

* আল্লাহর কাছে তিন প্রকারের ধ্বনি খুবই মাহবুব ১। মোরগের আওয়াজ ২। কুরআন তিলাওয়াতকারীর ধ্বনি ৩। শেষ রাত্রে তাওবা-ইস্তেগফারের আহাজারীর শব্দ। (মা'আরিফে সুলতান: খ: ৮ পৃ: ১৪)

* হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. এর নিকট তিনটি জিনিস প্রিয় ছিল।১। রাসুলুল্লাহ সা. এর সামনে বসে থাকা। ২। নিজ সম্পদ রাসুলুল্লাহ সা. এর উদ্দেশ্যে ব্যয় করা। ৩। রাসুলুল্লাহ সা. এর উপর অধিক পরিমাণ দরুদ শরিফ পাঠ করা।

* হযরত উমর রা. এর কাছে তিনটি কাজ মাহবুব ছিল। ১। ভাল কাজের আদেশ করা। ২। খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করা। ৩। হদুদ কায়েম করা।

* হযরত উসমান রা. এর নিকট তিনটি বস্তু মাহবুব ছিল। ১। খানা খাওয়ানো ২। সালামের প্রচার-প্রসার করা। ৩। রাত্রে নামাজ আদায় করা।

হযরত আলী রা. এর কাছে তিনটি বস্তু মনোনীত ছিল। ১। শত্রুর বিরুদ্ধে তরবারী চালনা। ২। মেহমানের আপ্যায়ন করা। ৩। গরমের দিনে রোজা রাখা।

*হযরত জিবরাঈল আ. এর নিকট তিনটি জিনিস প্রিয় ছিল। ১। নবীগণের কাছে অবতীর্ণ হওয়া।২। নবীগণের কাছে আল্লাহর বাণী পৌছিয়ে দেওয়া। ৩। আল্লাহ তা'আলার প্রসংশা ও কৃতজ্ঞতায় ব্যস্ত থাকা। (মা'আরিফে সুলতান খ: ৮পৃ: ৪ জান্নাত কা-মানজার: ৪৫৬

* ইমাম আবু হানিফা রা. এর কাছে তিন কাজ পছন্দনীয় ছিল। ১। দীর্ঘ রাত পর্যন্ত ইলম অর্জন করা। ২। আত্মগৌরব ছেড়ে দেওয়া। ৩। দুনিয়ার মুহাব্বত থেকে অন্তর খালি রাখা।

* ইমাম মালেক রা. এর নিকট তিনটি বস্তু মাহবুব ছিল। ১। হুজুর সা. এর রওযায়ে পাকে হাজির হওয়া। ২। রাসুলুল্লাহ এর রওযা মুবারকের খাদেম হওয়া।৩। রাসুলুল্লাহ সা. এর পরিবার-পরিজনের সম্মান করা।

* ইমাম শাফিয়ী রা. এর কাছে তিনটি জিনিস প্রিয় ছিল ১। মানুষের সাথে দয়াময় আচরন করা ২। কষ্টদায়ক বস্তু ছেড়ে দেওয়া। ৩। তরীকায়ে তাছাওফের তথা আত্মাশুদ্ধির পদ্ধতি অবল্বন করা।

*ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল রা. এর মনোনীত কাজ ছিল তিনটি ১। হাদিসসমূহ অনুসরণ করা। ২। রাসুলুল্লাহ সা. এর অনোয়ার থেকে বরকত অর্জন করা। ৩। রাসুলে আকরাম সা. থেকে বর্ণিত পদ্ধতির উপর চলা।(মা'রিফে সুলতান ক: ৮ পৃ: ৪-৫) জান্নাত কা-মানজার: ৪৮২

লেখক : মুফতি ইউনুছ চকরবী

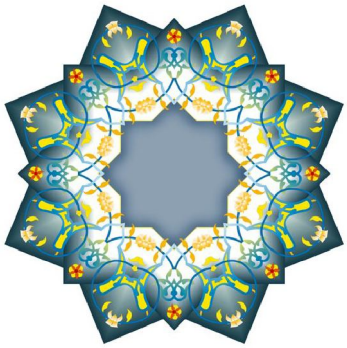

তারানা

তুমিই যে রাহমান

এম, এস ইয়ার হুসাইন ঢাকা

ভোরের পাখি গাইছে ওগো গাইছে তোমার গান
তুমি প্রভু তুমি মালিক তুমি যে রাহমান।
সকাল বেলা শিশির ভেজা ঘাসের দিকে তাকাই
তার মাঝেও তোমার নামের আওয়াজ শোনতে পাই।
মৃদু বাতাস দুলছে পাতা জপছে তোমার নাম
সেথাই শোনি বলছে ওগো তুমি মহিয়ান।
ঐ যে পাহাড় ঝর্নাধারা সাগরেরি মাতোয়ারা
সব কিছুতেই দেখছি মোরা তুমি বিদ্যমান।
রাতের আকাশ চন্দ্র-তারা মিটিমিটি জ্বলছে তারা,
কত সুন্দর বসুন্ধরা করেছ মোদের দান
তুমি প্রভু তুমি মালিক তুমি যে রাহমান।

স্রষ্টার সৃষ্টি

মুহা:রাশেদুল ইসলাম বরিশালী

সুসজ্জিত এ বসুন্ধরা করেছ তুমি সৃষ্টি,
দর্শন করিলে তোমার নিয়ামত জুড়ে যায় দৃষ্টি।
ভোর-বিহানে পাখির তানে তোমার গুণগান,
তোমার নামে মুয়াজ্জিন যপেযায় আজান।
পুষ্প শস্য দিয়ে তুমি পূর্ণ করেছ উদ্যান,
সুবাস দিয়ে গুল্মরাজি করেছ তুমি সুঘ্রান।
কাননে কুসুমকলি ফোঁটাও তুমি হে মহান,
রবি শশী দিয়ে তুমি করেছ ধরণী দীপ্তমান।
মেঘ হতে বারি বর্ষিয়ে গজাও তুমি বৃক্ষলতা,
গুলবাগিচার দৃশ্যগুলো যেন তোমার রূপে গাঁথা।
পাহাড় থেকে ঝর্ণাধারা করেছ তুমি প্রবাহিত,
নদ-নদী সাগর জলাধি করেছ তুমি তরঙ্গিত।

কেন?

ইবরাহীম আনোয়ারী

ওরে মানুষ তোমার জন্ম মানবের দেহে
আজ মনুষ্যত্ব কেন তোমার নাই
কেন তুমি চল ভোগ আর কামনার মোহে
বিবেক মান বিবেকের মত কিছু নাই।
কেন শুননা তুমি করুন কান্না অনাথের
কভু দেখনা ব্যথিতের কষ্ট অভাবী পথের
কেন অনুভব করনা রোগীর পিড়ীত জ্বালা
শিক্ষিত চেন না! চেন শুধু নাট্য পাঠশালা।
কেন তুমি চাওনা শুনিতে কষ্টে ভরা গল্প
তুমি জান? তোমার এ জীবন অতি স্বল্প
কেন করোনা গরিবেরে দান সতর টাঁকার বস্ত্র
আর কত তোমার দরকার ধারালো অস্ত্র-শস্ত্র।
কেন দুর্নিতীর হাতে গড়া দালান কোটা যত
দেখ!তুমি হবেই কোনদিন কারো কাছে নত
তোমার সব আছে কেন আরো দরকার
মাটি হবে একদিন তোমার সব অহংকার ।

হৃদয়ের আল আবরার

মুহা: নাজমুল হক বগুড়াবী

হে আমার হৃদয়ের আল আবরার
আমি তোমায় জীবনের চেয়ে ভালোবাসি।
তুমি আমার জ্ঞানের বাতি
তাই আমি নিত্যদিন তোমায় ভালোবাসি।
প্রভাতে যখন শুনে ছিলাম
তুমি নাকি আসবে ধরাতে।
তখন থেকে প্রভূর দরবারে
আমি বসেছিলাম দু'হাত পেতে।
যখন তুমি উদয় হলে
আল ফালার ময়দানে।
তখন আমি হামদে বারি
পাঠ করলাম প্রভূর শানে।
নামায শেষে মসজিদে বসে
দু'আ করলাম সবাই এক সাথে।
ওহে প্রভু তুমি কবুল করো মোদের মুখপত্র
সে যেন চিরদিন রয় আমাদের সাথে।
তোমার কোন ভয় নেই তুমি ছড়িয়ে দাও
এ দেশে জ্ঞানের আলো।
তুমি ঘোর অমানিশা দূর করে
নিয়ে আসো হকের আলো।
তুমি এযুগের শ্রেষ্ঠ রাহবার
তোমার রয়েছে হাজার সিপাহ সালার।
তাই তুমি বাতিলকে ধ্বংস করতে
উদয় হও বার বার।

চল পাঠক হব

শফিক বিন সাইফ

সব সখীদের পার হইয়া, চলছে পবন তরী।
চল চল আবরার নিয়ে, স্বীয় জীবন গড়ী।
আবরার হল পাঠক প্রিয়, পাঠক সকল বলে।
আমরা সবাই গ্রাহক হব, চল দলে দলে।
ঐআকাশের লক্ষ জ্যোতি, চাঁদের মত নয়।
শত পুস্তিকা যাচ্ছে পাওয়া, আবরারের মত নয়।
আবরার হল জনপ্রিয়, পাঠক সকল কয়।
দৃষ্টিতে মোর হাজার ফুল, সবই গোলাপ নয়।
গোলাপ হল ফুলের রাজা, কেমনে তুলনা হয়।
আল আবরার পড়ব মোরা, শিখব মোরা দ্বীন।
সতর্কবাণী থাকবে সেথায়, বাজায় যারা বীন।
মোদের প্রয়াস কবুল কর, ওহে মোদের প্রভু।
সত্য লেখার তাওফিক দিও, ভুল না লেখি কবু।

সবার জন্য এল

মুখতার হুসাইন সাদী

নবীন তরুন আয়রে সবে
আল আবরার পরিবারে।
আত্মশুদ্ধির জন্য এবার
বের হয়েছে আল আবরার।
লও হে মুমিন মনে প্রাণে
হেদায়েতের পাথেয় হবে।
দূর হবে সব দিলের কালো
ভরে যাবে নূরের আলো।

আল আবরার

মুহাম্মাদুল্লাহ ভোলবী

আগ্নি ছেদিয়া লেখনীর জগতে
এসেছে এক নতুন বীর
বুকে তাহার প্রভুত সাহস
উন্নত তার শীর
করেনা কাউকে ভয় এগিয়ে যায়
সদা সত্যের পথে
পরিয়ে দিয়েছে গলায় মালা
দ্বীনের প্রসূন গেথে
সুভাস ছড়াবে ধরারবুকে
এই তার দৃঢ়পন
লেখনি দিয়ে কাটবে জঞ্জাল
আনবে ভ্রান্তির মরন
লেখনি যে তার আলোর ধারা
হৃদয় তাহার প্রতুল কোমল
মাধুরীতে যে ভরা
চেয়ে দেখ হে বিশ্বমানব
রয়েছ যত ধীমান
কে সে মহা বিপদে হাল ধরে
দিয়েছে খুলে দার
সে যে আজ সবার কাছে পরিচিত
প্রিয় আল আবরার